জিয়াউর রহমান

আচ্ছাদিত ইতিহাস

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

জিয়াউর রহমান

আচ্ছাদিত ইতিহাস

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ১৯৯৯

প্রকাশক ❑ আফসারুল হুদা আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বর্ণবিন্যাস ❑ অনুলিপি কম্পিউটার ২২,তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী প্রকাশনা সংস্থা চৌধুরী মার্কেট নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

Ziaur Rahman : Aschadito Itihas (Ziaur Rahman : Concealed History)
Publisher : Afsar Brothers 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : June '99

Price : Tk. 60.00 U.S. $ 2

ISBN 984 482 173 X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ
একজন 'অসামান্য মানুষ'
প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস মিয়াকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. নভেম্বর '৭৫-এর আচ্ছাদিত ইতিহাস ১৩
২. সিপাহী বিপ্লব ঃ পুরোনো তত্ত্ব ও নতুন তথ্য ২৩
৩. শাসনকাল ঃ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ৩৬
৪. ব্যক্তিজীবন ঃ কিছু অজানা কথা ৫৫
৫. জিয়া হত্যাকাণ্ড ঃ একটি গভীরতর অনুসন্ধান ৬১
৬. জিয়াউর রহমান ঃ নেতৃত্ব কর্মকৌশল ও জাতীয় স্বার্থ ৭৪

পরিশিষ্ট

ক. জিয়াউর রহমান — সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ৯১
খ. প্রথম বেতার ভাষণ ৯২
গ. সিপাহী বিপ্লবের ১২ দফা দাবি ৯৫
ঘ. ১৯ দফা কর্মসূচি ৯৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম এর 'জিয়াউর রহমান ঃ আচ্ছাদিত ইতিহাস' বইটির পাণ্ডুলিপি পড়েছি। ভালো লেগেছে। একজন জাতীয় নেতার জীবন এবং কর্মকাণ্ডের আলোচনা-পর্যালোচনা সমৃদ্ধ ছোট্ট এই বইটি। জিয়ার শাসনকাল সম্পর্কে লেখকের আরো কয়েকটি লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সব লেখাতেই লেখকের পরিচয় মিলেছে একজন বস্তুনিষ্ঠ গবেষকের, একজন উষ্ণহৃদয় তথ্য সংগ্রাহক ও বিশ্লেষকের। এ ছোট বইটিতেও তিনি জিয়ার ক্ষমতারোহন, জীবনী, তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। এ ধরনের বই এ সমাজের তরুণ-তরুণীদের সামনে জিয়াকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জিয়া তো শুধুমাত্র একটা নাম নয়। জিয়া এ জাতির ইতিহাসের উজ্জ্বল এক অধ্যায়। একটা প্রতিষ্ঠান। একটা বিশ্বাস। এক ধরনের জীবন্ত প্রত্যয়। দেশপ্রেমের একটা উজ্জ্বল অনুভূতির নাম জিয়া। দৃঢ় সংকল্পের অভিব্যক্তির নাম জিয়া। জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় ঐক্যের নাম জিয়া। জাতীয় প্রবৃদ্ধির অন্য নাম জিয়া। তাঁকে ভুলবে কার সাধ্য? আধুনিক বাংলাদেশের যে দিকে তাকানো যায়, চোখে পড়বে জিয়ার প্রতিকৃতি। প্রায় সব খানেই।

বাংলার মাটি বড়ো উর্বর। এ মাটিতে যেমন ফলে সোনালী ফসল, অনায়াসে, তেমনি এ মাটি লাভ করেছে বহু জ্ঞানী-গুণীদের স্পর্শ। বহু কৃতি সন্তানের জননী বাংলাদেশ। জিয়াউর রহমান এ মাটির শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের একজন। এমন ব্যক্তির সম্পর্কে ড. মাসুমের আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। এ প্রচেষ্টার জন্যে তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

উনিশ শ, একাত্তরের মার্চের শেষ দিকে দৃষ্টি দিন। জনতার সংগ্রামী চেতনা এবং গণদাবির অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সিদ্ধান্তহীনতার চার দেয়ালে বন্দী, ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে যখন সমগ্র জাতি সম্বিতহীন, দিক নির্দেশনাহীন, শোক বিহ্বল, কি করা প্রয়োজন সে সংকটময় মুহূর্তে, এ সম্পর্কে যখন কোন দিক নির্দেশনা নেই, জিয়ার নেতৃত্বের পরশমনির স্পর্শেই তখন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ লাভ করেছিল গতি। জাতি পেয়েছিল নতুন উপলব্ধি। নতুন চেতনা। 'আমি জিয়া বলছি'– এ বাণী লক্ষ বুকে জাগিয়ে ছিল নতুন আশা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সকলকে করেছিল উদ্দীপ্ত। চারদিকের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে তাই হয়েছিল নতুন আশার দীপশিখা। ঐ মুহূর্তে জাতি এর চেয়ে বেশি কিছু চায়নি। আশাও করেনি।

শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। স্বাধীনতা অর্জনের

www.pathagar.com

জন্যে যে বন্ধুর পথ তা-ও তিনি দেখালেন। মুক্তিপাগল জনগণকে সজ্ঘবদ্ধ করে অগ্রসর হলেন। ২৫শে মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় কালে অন্যকোন কণ্ঠস্বর জাতি শোনেনি। পায়নি অন্য কোন দিক থেকে কোন কর্তৃত্বব্যঞ্জক ঘোষণা বা নির্দেশ। জেড ফোর্সের সংগঠক ও নির্দেশক হিসেবে পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর ভূমিকা এ জাতি মনে রেখেছে কৃতজ্ঞতার সাথে। তিনি ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শামিল হলেন ১৯৭৫ সালে। ক্ষমতাসীন হয়ে বাংলাদেশ রাজনীতির গতিপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন আনলেন। রাজনীতি যে জনকল্যাণকর এক কর্ম-উদ্যোগ এবং সুপরিকল্পিতভাবে যে এ কর্মকাণ্ডের যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন, তা-ও এ জাতি জানার সুযোগ লাভ করে। এ জাতির অধাত্মসত্তা মিশে রয়েছে জিয়ার আদর্শের সাথে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে। এমনি এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে ড. মাসুম পরিচিত করতে চান সাধারণ পাঠককে, ছোট্ট এ বইটির মাধ্যমে। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হোক এই আমার কামনা।

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

নন্দিত করবার জন্য অথবা নিন্দিত করবার জন্য এ গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থ অজানাকে জানবার জন্য। দুর্বোধ্যকে সহজ করবার জন্য। আচ্ছাদিত ইতিহাসকে আলোয় উদ্ভাসিত করবার জন্য। বস্তুনিষ্ঠভাবে, নিরপেক্ষভাবে আমাদের অতীতকে বুঝবার জন্য। একাডেমিকভাবে নিকট অতীতকে বিশ্লেষণ করার সুবিধে এই যে, তথ্য প্রমাণাদি এখনো গহীন গভীরে হারিয়ে যায়নি। অসুবিধা এই যে, ঘটনাবলী সময়ের পরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হয়নি, তবু প্রয়োজন সময়কে ধরে রাখা। নিজেদের আয়নায় নিজেদেরকে দেখা। আমার কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, আমরা নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই জানি না। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিশ্বাস করি না। লেখার যোগ্যতা এবং অভ্যাস যেমন কম, তেমনই মন ও মননেও রয়েছে ভাটা। রাজনৈতিক সংবাদের জন্য যেমন আমাদের নির্ভর করতে হয় বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের উপর, তেমনি রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্যও নির্ভর করতে হয় পাশ্চাত্যের উপর। এই জাতির ঘটনাবহুল সিকি শতাব্দীর ইতিহাস যতটা না লিফ শুল্‌জ, মাসকারেনহ্যাস, মার্কাস ফ্রান্ডা, ব্যার্ট্রোসি বা জেরিং-রা জানেন আমরা ততটা বিশ্বস্ততার সাথে জানি না। তথ্য ভান্ডার বা সংশ্লিষ্ট ভিআইপি'দের কাছে আমাদের নৈকট্য অতটা সহজ ও একাডেমিক নয়। তার কারণ আমরা 'শ্বেতকায়' নই। এই গোলামির মানসিকতা কতদিনে কাটবে কে জানে?

বর্তমান গ্রন্থটি একটি মৌলিক গবেষণার উদ্বৃত্ত ফসল। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি আমার পি.এইচ.ডি সন্দর্ভের জন্য তৃতীয় বিশ্বে সামরিক শাসনের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে গবেষণা শুরু করি। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল ছিল আমার 'কেস স্টাডি'। সঙ্গত কারণেই জিয়া এবং তাঁর শাসনকাল, পূর্বাপর ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করি। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই 'সিভিল সোসাইটি'-এর আর সব সদস্যের মতো আমিও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কাজ শুরু করি। সামরিক শাসন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন না হলেও ব্যক্তি জিয়া এবং তাঁর দেশপ্রেম সম্পর্কে আমি নতুন করে ভাবতে বাধ্য হই। এই গ্রন্থটি সেই ভাবনার বিক্ষিপ্ত বিন্যাস।

সংগৃহীত তথ্যকে কিছুটা তত্ত্বের লেবাস দিয়ে, কখনো কখনো একেবারে সাদামাটা ভাষায় আমি নিরেট সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সমাদৃত হয়েছে। বিগত ৫ বছরে, ১৯৯১-৯৬ সালে যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন ছিল তখন এইসব

www.pathagar.com

লেখার যথেষ্ট মূল্যায়নের সুযোগ ছিল বলে আমার কোন কোন বন্ধু মনে করেন। তবে মূল্যায়ন অর্থ যদি 'সুবিধে' হয়, তাহলে সে সুবিধে গ্রহণে আমি রাজি ছিলাম না। এই সমাজে এমন কিছু লোক সব সময়ই আছে এবং থাকবে যারা 'অসুবিধা'কে সুবিধের চেয়ে শ্রেয় জ্ঞান করেন। এই ক্ষেত্রে আফসার ব্রাদার্স-এর কর্ণধার জনাব আফসারুল হুদা বাড়তি অসুবিধা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন।

গ্রন্থটি লেখা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমার পরিবার-পরিজনরা পরিবেশ দিয়েছে। পরিশ্রম করেছে। স্নেহানুজ 'জিয়া' এবং সন্তানসম 'রাহাত' তাদের সবটুকু শুভেচ্ছা ঢেলে দিয়ে বইটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে চেয়েছে। আমার জীবনসাথী দীনা আশরাফী সোহেলীর অব্যাহত প্রেরণা এবং সহৃদয়তা এ গ্রন্থটিকে সম্ভব করেছে। আমার 'বড়কুটুম' রানা ও রুমী তাদের মন ও মনন দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার বিভাগের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অকৃপণ সহযোগিতায় ধন্য এ গ্রন্থ। সবার জন্য শুভ কামনা।

তবে ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা ভুল এবং ত্রুটি-সবই আমার। গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠক সমাজের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. আবদুল লতিফ মাসুম
সহযোগী অধ্যাপক
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

নভেম্বর '৭৫-এর আচ্ছাদিত ইতিহাস

স্থান বঙ্গভবন।

তারিখ ২ নভেম্বর, ১৯৭৫।

সময় রাত ১২-৩০টা।

কর্নেল রশিদ ঘুমোতে যাচ্ছেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসার। স্যার ! সর্বনাশ হয়েছে। বঙ্গভবন প্রহরারত সৈন্যরা চলে যাচ্ছে। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আর সবাইও চলে যেতে চাচ্ছে।

কর্নেল রশিদ বুঝলেন সংকট শুরু হয়েছে। ক'দিন ধরে যে বারুদের গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে, এখন তা নাকে ঢুকছে।

রহস্যাবৃত '৭৫-এর নভেম্বর-এর সঙ্কটময় দিনগুলোর শুরুটা এরকম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেনানিবাস ও ঢাকা শহরে জোর গুজব রটেছিল একটা কিছু হতে যাচ্ছে। খোদ প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদও জানতেন একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

(Anthony Mascarenhas, Bangladesh : A Legacy of Blood, P. 90)

কিন্তু ঘটনার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মোটামুটিভাবে সেনাবাহিনী বনাম বঙ্গভবন স্নায়ুযুদ্ধের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল।

টাগ অব ওয়ার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর কারণে সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব তথা নিয়ন্ত্রণের সঙ্কট দেখা দেয়। একটি সফল অভ্যুত্থানের স্বাভাবিক অনিবার্যতায় সেনাবাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়ে। আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবনে স্থান নেন। তারা সেখান থেকে সফলভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেও সেনাবাহিনীর সাথে সঙ্গত কারণেই বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা মেজরদের এই আচরণকে 'মেজর জেনারেলের' আচরণের মতো মনে করেন।

(Emajuddin Ahamed, Military Rule and the Myth of Democracy, P. 73)

www.pathagar.com

সিনিয়ররা চাচ্ছিলেন মেজররা সেনানিবাসে ফিরে এসে তাঁদের কমান্ড মেনে চলুক। কিন্তু রশিদ-ফারুকরা নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষমতা গ্রহণের উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সেনানিবাসে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। ছয় জন ক্যু নেতা তাদের ট্যাঙ্ক বহর ও সেনা-সামন্ত নিয়ে বঙ্গভবন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। অপরদিকে, সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফ এবং ঢাকা ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিল সেনানিবাস নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এই দুই সিনিয়র অফিসার প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, তারা এক দেশে দুই সেনাবাহিনী–এই অবস্থাকে কোনক্রমেই মেনে নেবেন না। খালেদ ও জামিল রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে আগস্ট অভ্যুত্থানকে মেনে নিতে পারেননি।

খালেদ ছিলেন অনেক সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আর শাফায়াত জামিলের 'হট হেডেট' বলে বদনাম ছিল।

বিবদমান এ দু'পক্ষের মাঝে অবস্থান করছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান। জাতির এই দু'জন অভিভাবকই চাইতেন দু'পক্ষের সমঝোতা। তাই কোন গ্রুপকে বিরূপ করতে পারে, এরকম কার্যব্যবস্থা গ্রহণে তারা উভয়ই বিরত ছিলেন। জিয়া তার উত্তরাধিকার এবং আচরণের কারণেই উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সেনা সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা বা সমদূরত্ব বজায় রাখেন। পরবর্তীকালে এই ভারসাম্যের কারণে তিনি উভয় পক্ষের অনাস্থার সম্মুখীন হন।

জেনারেল ওসমানীও প্রায়ই একই অবস্থার সম্মুখীন হন। তবে ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন।

১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে। পরস্পর অবিশ্বাস, সন্দেহ, হানাহানি চরমে ওঠে। শান্তি সম্প্রীতির পরিবর্তে হিংসা ও শত্রুতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩ নভেম্বর ক্যু

২ নভেম্বর গভীর রাতে পাল্টা অভ্যুত্থান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোমধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গভবন থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে খোন্দকার মোশতাকের সাথে ক্যুর নেতারা শলা-পরামর্শে বসেন।

কর্নেল ফারুক চাইলেন বিমানবন্দর, ঢাকা সেনা সদর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে।

www.pathagar.com

ধীর-স্থির মানুষ কর্নেল রশিদ রক্তপাত এড়িয়ে সঙ্কটমুক্তির কথা বললেন। খোন্দকার মোশতাকও আপোষ-রফার পরামর্শ দিলেন।

কর্নেল ফারুক তড়িৎ গতিতে তিনটি কাজ করলেন ঃ

(১) বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ,

(২) ব্যক্তিগতভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত ট্যাঙ্ক বহরের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং

(৩) বঙ্গভবনে অবস্থানরত ট্যাঙ্কগুলোকে প্রধান ফটকের বাইরে ডিফেন্সিভ অবস্থানে স্থাপন।

এদিকে কর্নেল রশিদ সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াকে ফোন করলেন। জিয়া তখন ঘুমে। বেগম জিয়া তাঁকে ডেকে তুললেন। কর্নেল রশিদ জিয়াকে তখনই বঙ্গভবনে আসার অনুরোধ জানালেন। জিয়া এবারও মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি বঙ্গভবনে না এসে কর্নেল রশিদকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কর্নেল রশিদ খালেদ মোশাররফকে ফোন করলেন। খালেদ মোশাররফ তাকে বললেন, যা প্রত্যাশিত তাই হচ্ছে। তিনি রশিদের সাথে ফোনে আলাপ সংক্ষিপ্ত করলেন। তারপর বিপদাপন্ন মেজররা একে একে অনেককে ফোন করলেন। বিডিআর, এয়ার চীফ, নেভি চীফ সবাই তাদের হতাশ করলেন। কিন্তু কেউ না এলেও সেনাবাহিনীর ঐক্যের প্রতিভূ ওসমানী এলেন। তিনি এসেই জিয়াকে ফোন করলেন। ততক্ষণে জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসমানী খালেদকে ফোন করলেন। খবর পাওয়া গেল খালেদ মোশাররফ ক্যু-এর নেতৃত্ব স্বহস্তে পরিচালনা করছেন। কর্নেল শাফায়াত জামিল প্রধান মিত্র হিসাবে তাঁর সাথে রয়েছেন। ইতোমধ্যে পাল্টা অভ্যুত্থানকারীরা বেতার, টিভি, এয়ারপোর্ট, টেলিফোন ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখলে নিয়ে আসে। জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করে। একটি গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি অত্যাসন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এমনি এক পরিস্থিতিতে রাত ৩টার পরে খালেদ নিজে রশিদকে ফোনে 'নরম-গরম' কথা বলেন। রশিদ আপোষের সাথে কথা না বলে মোকাবেলার কথা বলেন। ভোর হওয়ার আগেই শাফায়াত জামিলের ৪৬ ব্রিগেড বঙ্গভবন ঘেরাও করে। সেখানে এক নিদারুণ ভীতিজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। রশিদ নিজেই ট্যাঙ্ক বাহিনীর তদারকি করছিলেন। বঙ্গভবনে যখন এই ভীতিজনক অবস্থা, তখন কেন্দ্রীয় কারাগারে আরও ভীতিজনক ঘটনা ঘটে যায়। আওয়ামী লীগের চার নেতা তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন। পাল্টা অভ্যুত্থানকারীরা এই চার নেতা, বিশেষত তাজউদ্দীনের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ভারতের সহায়তায় পাল্টা সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন, এমন একটি গুজবের প্রেক্ষিতেই চার নেতা নিহত হন।

(সূত্র ঃ Larence Lifschultz, Bangladesh: The Unfinished Revolution)

৩ নভেম্বর সকাল হতে না হতেই পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে ওঠে। বিমান বাহিনী প্রধান তোয়াবের নির্দেশে (তোয়াবকে সেপ্টেম্বরে রশিদরাই বিমান বাহিনী প্রধান নিয়োগ করেন) দুটো মিগ বঙ্গভবনে বোমা বর্ষণের মহড়া দেয়। খোন্দকার মোশতাক ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নেন। জেনারেল ওসমানী উস্কানির মুখে সবাইকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ জানান। সকালের দিকে খালেদ মোশাররফের পক্ষ থেকে একটি ছোট প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে এসে হাজির হন। এদের মধ্যে ছিলেন দু'জন কর্নেল। খালেদ মোশাররফের দাবি ছিল ৩টি ঃ

(১) বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।

(২) জিয়ার বদলে একজন নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করতে হবে।

(৩) খোন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে বহাল থাকবেন।

কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বন্ধু দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখতে হবে (স্পষ্টত ভারত এবং রাশিয়ার কথা বলা হয়েছে।) খোন্দকার মোশতাক দাবিসমূহ অগ্রাহ্য করেন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পদত্যাগ ৩ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে কার্যকর হবে বলেও তিনি ঐ প্রতিনিধি দলকে জানিয়ে দেন। দু'ঘন্টা পর প্রতিনিধি দল আবার ফিরে আসে। তাঁরা এবার তৃতীয় দাবিটি উহ্য রাখে। ট্যাঙ্ক প্রত্যাহারের চেয়েও তাঁরা একজন নতুন সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের জন্য চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু প্রতিনিধি দলের কেউই খালেদ মোশাররফের নাম প্রস্তাব করেনি। খোন্দকার মোশতাক আবার একই কথা বলেন। তিনি যেহেতু প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। জেনারেল ওসমানীকে প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে জানালে তিনি ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর কার্যকারিতার অবসান ঘটেছে। বৃদ্ধ জেনারেল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, 'তোমরা গোল্লায় যাও, যা ইচ্ছা তাই করো, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।' এর পরেও কয়েক ঘন্টা ধরে ঐ লোকেরা বঙ্গভবন-সেনানিবাসে দৌড়াদৌড়ি করেন। কিন্তু তাদের দূতিয়ালী ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

রশিদ অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। অনেক টানাপোড়েনের পরে মেজর হাফিজের মধ্যস্থতায় একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়, মোশতাকের অনুরোধে উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে আগস্ট ক্যু নেতারা বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে যাবেন। সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়সহ সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। বিমান বাহিনীর প্রধান এম জি তোয়াবকে এসব নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ৩ তারিখ মাগরিব ওয়াক্তে আগস্ট ক্যু-এর নেতৃবৃন্দ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকারে করে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে বঙ্গভবনে খোন্দকার মোশতাক তাঁর নিজ বাসভবনে যাওয়ার জন্য তৈরি হন। খালেদ মোশাররফ তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। সবার অনুরোধে মোশতাক রাজি হন। তিনি দুটো শর্ত দেন। ১৫ আগস্টের পরে যেমন তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হবে, এবারও তেমনই বললেন। আরও বললেন, মন্ত্রীসভাকে খোলামেলা আলাপ-আলোচনার পর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। খালেদ মোশাররফ দুটো শর্তই মেনে নেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক আহূত হয়। ২৬ সদস্যের ক্যাবিনেট বঙ্গভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ক্যাবিনেট রুমে বৈঠকে বসে। তাঁরা জেল হত্যার তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেন। মন্ত্রীদের অনেকেরই কথাবার্তায় নতুন সুর। তাঁরা প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাককে হত্যাকারীদের বিদেশ যেতে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। মন্ত্রীসভা খালেদ, জেনারেল খলিল, তোয়াব এবং কমোডর খানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে।

আকস্মিক ঘটনা

মন্ত্রীসভা যখন এমনতর অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিল তখন ঘটে সেই নাটক। যা ঘটনাবলীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আকস্মিকভাবে সজোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। হাতে সেনাসুলভ বেতের ছড়ি। সাথে স্টেনগানসহ ৫জন অফিসার। এতে মন্ত্রীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। মন্ত্রীরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করেন। একজন খোন্দকার মোশতাকের মাথায় স্টেনগান ঠেকায়। ওসমানীর হস্তক্ষেপে মোশতাক বেঁচে যান। শাফায়াত জামিল খোন্দকার মোশতাককে জাতির পিতার হত্যাকারী, চার নেতার

www.pathagar.com

হত্যাকারী এবং মীর জাফর ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেন। তিনি তাঁর পদত্যাগের পরামর্শ দেন। মোশতাক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। মোশতাক লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন। শাফায়াত জামিলরা মোশতাককে দিয়ে আরও দু'একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিয়ে রাখেন। এবার শাফায়াত জামিল প্রস্তাব করেন, প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন। মন্ত্রীসভার কোন একজন পরামর্শ দেন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট উভয়ই মৃত। সুতরাং, সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা স্পীকারের কাছেই হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। এতে শাফায়াত জামিল রেগে যান এবং তার কথা মতো দু'জন ক্বরিৎকর্মা মন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে ঐদিন গ্রেফতার করা হয়।

৫ নভেম্বর ঃ সায়েম প্রেসিডেন্ট

প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে ৫ নভেম্বর বেলা একটার সময় বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হয়। ওসমানী তাঁকে সুসংবাদটি দিলে তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন। অবশেষে অনুরোধে ঢেঁকি গেলেন। তাঁর সম্মতির ভিত্তিতে পরদিন অর্থাৎ ৬ নভেম্বর তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত চার বছরে দেশের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট হলেন সায়েম, ৬ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

ক্যু ঃ রাজনৈতিক চরিত্র

৩ নভেম্বরের ক্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু সংবেদনশীল ঘটনা ঘটে। রুশ-ভারতপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলো ৪ নভেম্বর, মুজিব দিবস হিসেবে পালন করেন। তারা ঢাকা শহরে মুজিব স্মরণে শোক মিছিল বের করেন। একটি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা এবং ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ এমপি। দেশের ডান-বাম সব রাজনৈতিক শক্তিই ৩ নভেম্বর ক্যুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করে।

সেনানিবাস পরিস্থিতি

১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ক্যুকে সাধারণ সৈনিকরা অফিসারদের ফায়দা হাসিলের কারসাজি হিসাবে চিহ্নিত করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সময়কালে তদানীন্তন সরকারের সেনাবাহিনীর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণে সৈনিকরা ছিল

www.pathagar.com

ক্ষুব্ধ। তারা খালেদের ক্যুকে ভারতপন্থী বলে মনে করে, একে রুখে দাঁড়াতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। জাসদ-এর নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' খালেদ মোশাররফের ক্যুকে প্রো-ইন্ডিয়ান ক্যু-বলে অভিহিত করে। তারা খালেদকে অপসারণের আহবান জানিয়ে ক্যান্টনমেন্টে লিফলেট বিতরণ করে। এসব লিফলেট সৈনিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কর্নেল শাফায়াত জামিল ৪৬ ইনফেন্টরী ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করা সত্ত্বেও নিজেকে নিরাপদ বোধ করছিলেন না। তিনি ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার এবং রশিদের ২নং ফিল্ড আর্টিলারীকে অস্ত্রহীন অবস্থাও বিপজ্জনক মনে করছিলেন। তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি রংপুর থেকে ১০ এবং ১৫ ইস্ট বেঙ্গলকে ডেকে পাঠান। কিন্তু এ দুটো রেজিমেন্ট সময় মতো ঢাকা আসতে ব্যর্থ হয়। মুজিব হত্যার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সাধারণ সৈনিকরা শাফায়াত জামিলকে বদরাগী ও কঠোর বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

পক্ষান্তরে, জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর গ্রেফতার সৈনিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ছিলেন সৈনিকদের কাছে পিতৃপুরুষতুল্য। নানা কারণে খোন্দকার মোশতাকও সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলেন। দেশ পরিচালনায় এসব নেতার অনুপস্থিতি সৈনিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়।

বিপ্লবের প্রস্তুতি

কর্নেল তাহের তখন অসুস্থ ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের বাসায় ছিলেন তিনি। তিনি বলেন, "৩ তারিখ ভোর ৪টায় আমি একটি টেলিফোন কল পাই। অপরপ্রান্তে ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি তাঁর হাউস এরেস্ট হওয়ার কথা আমাকে জানালেন। সাহায্য চাইলেন। এরপর টেলিফোন লাইন কেটে গেল। ঐদিন বেশকিছু এনসিও এবং জেসিও আমার বাসায় আসে। তারা জানায়, খালেদের ক্যু-এর পিছনে ভারত আছে। বাকশালীরা আবার ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। তারা আরও জানায়, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য কোর ট্রুপস-এর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় গুলি শুরু হতে পারে।"

(Col. Taher : Last Testament)

তাহের এসব সৈনিকদের কাজে লাগান। সৈনিকদের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৬ নভেম্বর সন্ধ্যারাতে যে কোন

www.pathagar.com

নির্দেশের জন্য সৈনিকরা প্রস্তুত থাকবে। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১টায় বিপ্লব শুরু হবে। বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) খালেদ মোশাররফদের অপসারণ,

(খ) জিয়াউর রহমানের মুক্তি,

(গ) বিপ্লবী সৈনিক কমান্ড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা,

(ঘ) দল-মত নির্বিশেষে সকল বন্দীর মুক্তি,

(ঙ) সর্বদলীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (বাকশাল বাদে)

(চ) বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা বাস্তবায়ন।

(সূত্র ঃ Larence Lifschultz, Bangladesh : The Unfinished Revolution, P. 90)

৭ নভেম্বর ঃ দিনলিপি

রাত ১ টা ঃ ঢাকা সেনানিবাস। পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত সৈনিকরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্র গুদাম ভেঙ্গে অফিসারদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সৈনিকরা মিছিলে হাজির হয়। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর', 'সিপাহী-জনতা এক হয়েছে, এক হয়েছে' 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ', 'খোন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ।' তারা কিছু ক্ষতিকর শ্লোগানও দেয়। যেমন ঃ 'সিপাহী জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই', 'সুবেদারের উপরে অফিসার নাই' ইত্যাদি। তারা রেডিও স্টেশন, টিভি, টেলিফোন ভবন, পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

রাত ৩টা ঃ তারা অবরুদ্ধ জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারী সদর দপ্তরে জিয়াকে কাঁধে করে নিয়ে আসে সৈনিকরা। সৈনিকরা আনন্দ আপ্লুতভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। অসংখ্য সৈনিক তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। তাঁকে কাঁধে নিয়ে নাচতে থাকে। জিয়া তখনও নাইট ড্রেসে ছিলেন। জিয়া মুক্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল তাহের সেখানে পৌছান। জিয়া আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। সৈনিকরা জিয়াকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করলে জিয়া তা তাহেরকে দিয়ে বলেন, এগুলো তাহের ভাইকেই মানায়।

রাত ৪টাঃ তাহের গ্রুপের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক জিয়াকে রেডিও ভাষণের নামে শহরে নিয়ে আসার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে রাত দেড়টা নাগাদ সিপাহী বিপ্লবের খবর বেতার মারফত দেশবাসীর কাছে পৌঁছে গেছে। জিয়াকে

www.pathagar.com

ঐসব ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জিয়া এ সময় বেতারে একটি ছোট ভাষণ দেন। (ভাষণটি সেনানিবাসেই রেকর্ড করা হয়।)

আমি জিয়া বলছি

ভাষণটি নিম্নরূপ ঃ

"প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামু আলাইকুম।

আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ আনসার এবং অন্যান্যের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে অফিস, আদালতে, যানবাহন, বিমান বন্দর, নৌ- বন্দর ও কল-কারখানাগুলো পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।"

খালেদ মোশাররফের কথা

সিপাহী-বিপ্লবের কথা খালেদ প্রথম জানতে পারেন ৬ তারিখ রাতে। ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে তাঁকে এ খবর দেয়া হয়। খালেদ বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন আগে থেকেই। এর আগের দিন তিনি তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনকে অজ্ঞাত নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। রাত ১১-৩০ টায় খালেদ শাফায়াত জামিলকে সাথে নিয়ে বঙ্গভবনে আসেন। সেখানে শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠক নির্ধারিত ছিল। বিপ্লবের খবর পেয়ে খালেদ বঙ্গভবনেই থেকে যান। পরে বিপদ বুঝে খালেদ তাঁর নিজস্ব কারে কর্নেল হুদা, কর্নেল হায়দারসহ শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ম ইস্ট বেঙ্গল সদর দফতরের দিকে রওয়ানা হয়। পথে ফাতিমা নার্সিং হোম-এর কাছাকাছি এলে কারটি বিকল হয়ে যায়। খালেদ নার্সিং হোমে প্রবেশ করে একটি ফোন করেন। ওদিকে থেকে 'ওকে' সিগন্যাল পান। তাঁরা তিনজন ১০ম ইস্ট বেঙ্গলে উপস্থিত হন। সেখানেই রাত কাটান। ৭ নভেম্বর সকালের দিকে বিপ্লবী সিপাহীরা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল যায়। তারা সিপাহীদের যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। দ্রুত সিপাহীরা মত পাল্টে ফেলে। খালেদকে

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করে তারা বিপ্লবে যোগ দেয়। কমান্ডিং অফিসারের রুমে বসা ছিলেন খালেদরা। সিপাহীদের বিপ্লবী তৎপরতায় ঐ ইউনিটের অফিসাররাও চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতি বিপ্লবী সাজার জন্য হোক অথবা তাহেরের প্রভাবেই হোক, দু'জন ক্যাপ্টেন খালেদসহ ঐ দু'জন অফিসারকে তখনই হত্যা করে। জিয়া যখন জানতে পারেন খালেদ ১০ম বেঙ্গলে রয়েছেন, তখন তিনি কমান্ডিং অফিসারকে তাঁর নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে, টেলিফোনের ঐ নির্দেশটি দেয়ার সময় তাহের সেখানে উপস্থিতি ছিলেন এবং সেটাই নাকি ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। আর এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক ঝঞ্জাবহুল অধ্যায়ের। (Foreign Affairs Reports, August 1982)

বাংলাদেশের ইতিহাস দ্রুত বদলায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিবর্তিত হয় অতি সহজে। এর মাঝে জনগণের ইচ্ছাগুলো অজ্ঞাতভাবে জয়ী হয়ে ওঠে। শত্রু-মিত্র নির্ভুলভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। ৭ই নভেম্বরে গোটা বিশ্ব দেখেছে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন ইচ্ছার বিদ্যুৎচমক। ৭ই নভেম্বর শিখিয়েছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃপ্ত উদাহরণ। সর্বস্তরের মানুষের দুর্জয় ঐক্যের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনমনীয় আকাঙ্ক্ষা। হাজার বছর ধরে সে ঐক্য-চেতনা চিরজাগরুক থাকুক। আমাদের জাতীয় জীবনে আর এক সঙ্কটময় পাদভূমিতে দাঁড়িয়ে এই সম্মিলিত প্রার্থনা হোক কোটি কোটি মানুষের।

www.pathagar.com

২

সিপাহী বিপ্লব ঃ পুরোনো তত্ত্ব ও নতুন তথ্য

যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব (Political Leadership) রাষ্ট্র ব্যবস্থায় (Political System) তাদের কর্তৃত্বের বৈধতা হারিয়ে ফেলে এবং জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ তথা আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যর্থ হয় তখন সমাজে ভাঙন এবং অস্থিরতা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বমুখর সংঘাতময় এবং অনেকটা নৈরাজ্যের পরিবেশকে সমাজবিজ্ঞানী Huntington, Praetorianism বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলায় Praetorianism শব্দটির প্রতিশব্দ ব্যবহৃত না হলেও আমরা সম্ভবত সামরিক হস্তক্ষেপ প্রবণ অবস্থাকে Praetorianism বলতে পারি। Huntington, Praetorianism এর বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যা করেন এভাবে ঃ "The wealthy bribe, students riot, workers strike, mobes demonstrate and Military coup."[১] বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের আগস্ট অভ্যুত্থান বা সিপাহী বিপ্লব প্রাক রাজনৈতিক চালচিত্র যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে Praetorianism এর ঐ সব বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। একজন বিদেশী গবেষক Peter J. Bertocci এবং বাংলাদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ এবং ড. মিজানুর রহমান শেলী কম বেশী বাংলাদেশের ঐ অবস্থাকে Praetorianism বলে বর্ণনা করেছেন[২]। একটি রাজনৈতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য জনগণ মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি শক্তিশালী সরকারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে এটাই 'রাজনৈতিক ব্যাকরণের' দাবি। আর Military Politics সম্পর্কে আধুনিক দুনিয়ার জনপ্রিয় লেখক Edward Fiet ঠিক এই অবস্থাকে জনগণের জন্য Welcome Relief' বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট প্রক্রিয়ায় ৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব ছিল এমনি ধরনের একটি Welcome Relief। এই পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা বা বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ অব্যাহত অনিশ্চয়তা, নৈরাজ্য এবং দেশীবিদেশী ষড়যন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করে একজন শক্ত মানুষের (strong Man) হাতে শক্ত সরকার প্রতিষ্ঠার বৈধ কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহী বিপ্লব ছিল সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল

www.pathagar.com

ঘটনা। "Entirely a new story, a story never known or told before."[৪] জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকে জনগণ 'মিছিলের স্রোত আর উল্লাস দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে।[৫] এই উপমহাদেশের সৈনিকরা সিপাহী বিপ্লব করেছিল ১৮৫৭ সালে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য, আর ১৯৭৫ সালে তারা আবার বিপ্লব করেছে তাদের ভাষায় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। 'সৈনিকরা ৭ নভেম্বরে' নির্দেশের পদসোপানকে অগ্রাহ্য করে, শৃংখলার ব্যারিকেড ভঙ্গ করে, জীবনকে বাজি রেখে বিপ্লবকে যেভাবে সফল করেছিল স্বাভাবিক সময়ে স্বাভাবিক নিয়মে তা কল্পনাও করা যায় না। একটি পেশাগত সেনাবাহিনী (Professional Army) এর জন্য এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। এটি রাজনীতি বিজ্ঞান (Political Science)-এর তথাকথিত প্রথাগত গতানুগতিক অভ্যুত্থান (Coup) নয়। এটি কোন প্রতি বিপ্লবও (Counter Coup) নয়। 'সত্যিকার অর্থে ছিল এটি বিপ্লব'[৬] দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রতিটি সৈনিকের আনুগত্য উজ্জ্বল ৭ নভেম্বর আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে একটি অনিবার্য মাইল ফলক। আমরা আমাদের এই বহমান নিবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিপ্লবের অনুঘটক, বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক ফলাফল বিশেষত সৈনিক-জনতার আস্থাশীল নেতা হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবস্থানের কথা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করবো।

৭ নভেম্বর ঃ তাত্ত্বিক ভিত্তি

৭ নভেম্বর বিপ্লবের উৎস মূল সমাধান করতে গেলে আমাদের দুটো পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। প্রথমতঃ আমরা বিপ্লবের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দেবার চেষ্টা করবো। দ্বিতীয়ত ঃ বাস্তব ঘটনাবলী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো। তাত্ত্বিক ভিত্তির জন্য আমরা এই জাতির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গৌরবময় সংগ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে চাই। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই জাতির শাশ্বত বিশ্বাস, চেতনা ও আদর্শবোধের যে ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল তা এই জাতিকে একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য, মর্যাদা তথা একটি Nationhood দিয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ লেখক বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে "End of a betryal and restoration of Lahore Resolution" বলে বর্ণনা করেছেন।[৭] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পশ্চিমা নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রের ফলে সেই লাহোর প্রস্তাবের সফল বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়[৯] এবং এই দেশ জাতি একটি

www.pathagar.com

Internal Colonialism এর যাতাঁকলে নিষ্পিষ্ট হয় আরও সিকি শতাব্দী। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের গণমানুষের আত্মজাগৃতির যে দ্বিতীয় ধারা শুরু হয় ১৯৭১ সালে তার সফল সমাপ্তি ঘটে। আন্দোলন ও সংগ্রামের এই সুদীর্ঘ দুই যুগের যাত্রাপথে এই জাতির মৌল বিশ্বাস ধর্ম বা সংস্কৃতি নিয়ে কোন দ্বৈধতা বা বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, অনুভূতি নিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। আবহমান লালিত জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনুধাবনে শাসককুল বা Political Elite রা ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতার পরে শাসকগোষ্ঠীর কতিপয় 'বিতর্কিত পদক্ষেপ' Questionable Actions জাতিকে 'চরমপন্থী' করে তোলে।[১০] বাংলাদেশের জনচিত্ত সম্পর্কে বলা হয় "They do not act but they react". ১৫ আগস্ট এবং পরবর্তীকালে ৭ নভেম্বর-এর পরিবর্তন ছিল জনচিত্তের ঐ জনপ্রিয় ধারাটির যথার্থ পরিপূরক। ৭ নভেম্বর '৭৫ এর সৈনিক জনতার গণজাগরণের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি এভাবে নির্মিত হতে পারে।

এবার আসা যাক বাস্তব দিকে। বাস্তব ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য '৭৫-এর ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। আমাদের ফিরে তাকাতে হবে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে। ইতিহাসের গহীন গভীরে যেমন আদর্শিক চেতনা অন্তর্নিহিত, তেমনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের শুরু। মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মায়ানমার বা ইন্দোনেশিয়ার মতো একটি Liberation Army তে পরিণত হয়। সেনাবাহিনীর রাজনীতিকরণ (Politicisation of Army) এতটা মাত্রায় ঘটে যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১১টি সেক্টরের ১৬ জন সেক্টর কমান্ডারের কেউই স্বাভাবিক চাকরিকাল শেষ করতে পারেননি। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত হন ৬ জন এবং সবাই তীব্র রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন।[১১] একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেনাবাহিনীর অন্যান্য পর্যায়েও। এ সত্য দ্বারা আমরা এটা প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছি যে, গোটা সেনাবাহিনী যেখানে রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থান করার কথা, সেখানে স্বাধীনতা-উত্তর সেনাবাহিনী Professionalism হারিয়ে ফেলে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দ্বন্দ্ব সংগ্রামের একটি পর্যায়ে সিপাহী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়।

৭ নভেম্বর-এর সিপাহী বিপ্লব ছিল ৩রা নভেম্বর প্রতি বিপ্লবের সরাসরি প্রতিক্রিয়া। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে সিনিয়র বনাম

www.pathagar.com

জুনিয়র এর যে সংঘাত শুরু হয় ৭ নভেম্বর এর সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঘটনা পরম্পরা [১২]

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরে অভ্যুত্থান নেতারা বঙ্গভবন থেকে প্রকারান্তরে দেশ শাসন করতে থাকেন। 'ইয়াং টার্কস' মেজররা সেনা ছাউনিতে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। ওদিকে আগস্ট অভ্যুত্থানের ভাববিহ্বলতা কেটে যেতে থাকে এবং সেনাবাহিনীর সিনিয়র সদস্যরা ক্রমশ মেজরদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষত ঢাকা ব্রিগেড প্রধান শক্তিমান কর্নেল শাফায়াত জামিল এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান গ্রুপের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখছিলেন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম এ জি ওসমানীও উভয় গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য নিরলস পরিশ্রম করছিলেন। কিন্তু শাফায়াত জামিলের কাছে শীঘ্রই জিয়ার ভারসাম্য আর ওসমানীর সমঝোতা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। শাফায়াত জামিল শীঘ্রই মুক্তিযোদ্ধা, মেধাবী অফিসার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে তার পরিকল্পনার ধারক ও বাহকে পরিণত করতে সক্ষম হয়। খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীতে তখন ছিলেন ৩ নং ব্যক্তি অর্থাৎ C.G. S (Chief of General Staff.)। ২নং ব্যক্তি Deputy Chief of Staff হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ভারতে প্রশিক্ষণরত থাকায় সেনাবাহিনীতে খালেদই জিয়াউর রহমান-এর পরবর্তী ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ান।

খ। ২ নভেম্বর রাতে শাফায়াত জামিলের সহযোগীরা রাজধানীর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থান নেয়। তারা রেডিও, টিভি, বিমানবন্দর এবং কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে। বঙ্গভবন ঘেরাও করে। দেশ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

গ। ৩ নভেম্বর ভোর রাতের দিকে একদল সামরিক অফিসার সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করে। তাঁরা তাঁকে রাতে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি অনুমোদন (Endorse) করতে চাপ প্রয়োগ করে। জিয়া সকাল ১১টায় সেনা সদরে সম্মিলিত জরুরি সভা আহবানের প্রস্তাব দেন। শাফায়াত জামিল প্রেরিত এই সব অফিসাররা জিয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন। তারা জিয়াকে হুমকি প্রদান করে। সেনা প্রধান হিসেবে দৃশ্যত জিয়ার কার্যকারিতা অচল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ঘ। সিনিয়র বনাম জুনিয়রদের এই সাংঘর্ষিক অবস্থায় ওসমানীসহ কয়েকজন সামরিক অফিসার মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। মেজর হাফিজের জোর সমঝোতা ও প্রচেষ্টা (Shuttle diplomacy)-এর ফলে আপোষ রফা হয়। আপোষ ফর্মূলা অনুযায়ী আগস্ট অভ্যুত্থান-এর নেতারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান। রাষ্ট্র তাদের সুখ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিশ্চয়তা দেয়।

ঙ। সেনাবাহিনীতে গুজব রটে যায় প্রতিবেশী দেশের নীল নক্সা অনুযায়ী জেলে অন্তরীণ তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসছে। আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতারা দেশ ত্যাগ করার প্রাক্কালে সংঘটিত হয় মর্মান্তিক জেল হত্যাকান্ড।

চ। খালেদ মোশাররফ ইতোপূর্বের সমঝোতা অনুযায়ী খোন্দকার মোশতাককে প্রেসিডেন্ট মেনে নিয়ে সেনা প্রধান হতে চাচ্ছিলেন। জনাব খোন্দকারকে কোনক্রমে রাজি করাতে না পেরে তিনি নিজে নিজেকে সেনা প্রধান ঘোষণা করেন এবং নৌ ও বিমান প্রধান তাকে সেনা প্রধানের ব্যাজ পরিয়ে দেন। কিন্তু জেল হত্যাকান্ডের ফলে অতি দ্রুত সবকিছু ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

ছ। শাফায়াত জামিল ক্যাবিনেট মিটিং চলাকালীন অবস্থায় সভাকক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি খোন্দকার মোশতাককে দারুণভাবে অপমান করেন এবং পদত্যাগে বাধ্য করেন। শাফায়াত জামিলের প্রস্তাব অনুযায়ীই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়।

জ। ৪ নভেম্বর রাজধানীতে একটি শোক মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়ে শেষ হয়। খালেদ মোশাররফ-এর বৃদ্ধা মাতা এবং ছোট ভাই রাশেদ মোশররফ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। সুতরাং ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষ ধারণা গড়ে ওঠে।

ঝ। আকাশবাণী ৩ নভেম্বর থেকে একে প্রো-মুজিব ক্যু বলে বর্ণনা করে। প্রতিবেশী শক্তির কথিত সংশ্লিষ্টতার পক্ষে এটি একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঞ। খালেদ মোশাররফকে প্রতিহত করার আহবান জানিয়ে সেনানিবাস এবং অন্যত্র লিফলেট বিতরণ করে জাসদ, সাম্যবাদী দল ও মুসলিম লীগ। এসব লিফলেট খালেদকে ভারতের এজেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং জীবন দিয়ে হলেও এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানানো হয়।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর ঃ রোজ নামচা

৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী গোটা জাতিকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। সৈনিকরা যখন লক্ষ করে জুনিয়র বনাম সিনিয়রদের দ্বন্দ্ব তাদের জীবনকে শংকাকুল করে তুলেছে, ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘর্ষ অত্যাসন্ন তখন তারা তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারা অফিসারদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং দলাদলি দেখে তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। যে গুটি কয়েক অফিসারদের সৈনিকরা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করতো তারাও কোন সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। সৈনিকরা যে নেতৃত্ব তথা দিক শূন্যতায় ভুগছিল এ পরিস্থিতিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর সেনাবাহিনী উইং অর্থাৎ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (B.S.S) সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা প্রধান কর্নেল তাহের তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ঢাকা আনা হয়। জাসদের সৈনিক সেল এর নেতারা সংকট সমাধানে ব্যাকুল সেনাবাহিনীর লোকদেরকে তাহের-এর কাছে নিয়ে যায়। রাজনীতির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এসব সৈনিকদের নিয়ে তাহের অসংখ্যবার সভা-সমাবেশ করেন। পরিচালিত গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যায়, সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক ও নন-কমিশন অফিসার পর্যায়ে জাসদ-এর মোট ২৪টি সেল ছিল।[১৩]

এসব সেলসমূহ সৈনিকদের Motivate ও সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ সর্বস্তরের সৈনিকরা বিপুল সংখ্যায় সংকটের মুক্তি কামনার লক্ষ্যে কর্নেল তাহেরের এলিফ্যান্ট রোডস্থ সাময়িক অবস্থানে ভিড় জমায়। এদের মধ্যে জিয়ার বিপুল সংখ্যক সমর্থক ছিল। সেনাবাহিনী তথা দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে জাসদ-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়।

জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিপাহী বিপ্লব পরিচালনার জন্য তাহেরকে সকল ক্ষমতা প্রদান করে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং সাধারণ সৈনিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উভয় সভায় তাহেরকে 'সর্বাধিনায়ক' দায়িত্ব দেয়।[১৪]

তাহের এবং তাঁর অনুসারীরা সৈনিকদের আপাতঃ ঐক্য বজায় রাখার জন্য জিয়া বিরোধী বক্তব্য দিতে বিরত থাকে। বরং জিয়াকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই সমস্ত

www.pathagar.com

কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এমন হাবভাব দেখান।[১৫] বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (B.S.S) তথা জাসদ তাদের আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বিপ্লবের ৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করে ঃ

১। সৈনিকরা সম্মিলিতভাবে বিপ্লব করবে।

২। ষড়যন্ত্রকারী খালেদ মোশাররফকে উৎখাত করা হবে।

৩। সৈনিকরা সেনাবাহিনী ও জন জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক সেনাবাহিনীর পরিবর্তে গণ-সেনাবাহিনী গঠিত হবে। সমাজ এই লক্ষ্যে পুনর্গঠিত হবে।

৫। বাকশাল ব্যতীত সকল দল সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকার গঠিত হবে।

৬। সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে।

৭। চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

এই সব লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ৬ তারিখে চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিপ্লবকালীন কর্মসূচি হবে নিম্নরূপ ঃ

১। ৬ তারিখ রাত ঠিক ১২-০০ মিনিটে অর্থাৎ 'জিরো আওয়ারে' বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের মাধ্যমে বিপ্লব শুরু হবে।

২। জীবন বাঁচানোর অনিবার্য প্রয়োজনেই কেবল হত্যা অনুমোদন করা যাবে।

৩। খালেদ মোশাররফকে গ্রেফতার করা হবে।

৪। জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হবে। কিন্তু তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।

৫। সৈনিকরা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করবে এবং বিপ্লবের পক্ষে শ্লোগান দেবে।

৬। প্রতিটি ট্রাকে কমপক্ষে একজন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোক থাকবে। তিনি সাধারণ সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন।

৭। ৭ নভেম্বর সকালে রেসকোর্সে সৈনিকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষিত হবে।

৮। সফল বিপ্লবের পর রেডিও টিভি, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, বিপ্লবী গণবাহিনী এবং জাসদ-এর কর্মসূচি এবং এর নেতাদের বক্তব্য প্রচার করবে।

৯। কোন সৈনিক লুটপাটে অংশগ্রহণ করবে না। তারা জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করবে। কাউকে এর অন্যথা করতে দেখলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

১০। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ইউনিট অধিনায়কদের সমন্বয়ে বিপ্লবী পরিষদ "Revolutionary Command Council" গঠিত হবে।

১১। সামরিক অফিসারদের বিপ্লবকে সমর্থন জানানোর আহবান জানানো হবে। যারা বিপ্লবকে সমর্থন জানাবে না তাদের গ্রেফতার করা হবে।

১২। কর্নেল তাহের বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক ঘোষিত হলেন। প্রতিটি সৈনিক তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য থাকবে।[১৬]

এখানে তাৎপর্যের সাথে লক্ষ করার বিষয় জাসদ নেতৃত্ব তথা কর্নেল তাহের জিয়াউর রহমানকে এক অন্তরীণ অবস্থান থেকে অন্য অন্তরীণ অবস্থানে নেবার 'ওপেন সিক্রেট' ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁকে মুক্ত করার এবং ক্ষমতায় বসানোর যে দাবি জাসদ করে জিয়ার সহযোগীরা তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করে। স্বয়ং জিয়াউর রহমান মার্কাস ফ্রান্ডাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ঐ দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছেন।[১৭]

বিপ্লবের শুরু

যথাসময়ে কোনরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ঘোষিত 'জিরো আওয়ারে' বন্দুকের গুলি আকাশে ছুঁড়ে বিপ্লব শুরু হয়। সৈনিকরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। সুবেদার সারোয়ার-এর নেতৃত্বে একদল সৈনিক বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পূর্বেকার কর্মসূচি নিয়ে জিয়ার বাসভবনের দিকে অগ্রসর হয়। জিয়া ভক্ত সাধারণ সৈনিকরা সারোয়ারের অনুসরণ করে। ফলে কর্নেল তাহেরের নির্দেশ মোতাবেক তাকে শহরে অন্তরীণ করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সাধারণ সৈনিকরা জিয়াউর রহমানকে কাঁধে করে আনন্দ করতে করতে Second Field Artilery Regiment-এ এনে বসায়। একদল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মী তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে আসে কর্নেল তাহেরের কাছে। তাঁরা কর্নেল তাহেরের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই প্রশ্ন করেন কর্নেল তাহের। 'Where is Zia?' যখন সব কিছু জানতে পারেন তখন তাহের রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে গোঙাতে থাকেন এবং "All lost Everything is lost" বলে আহাজারী করতে থাকেন এবং কর্নেল তাহের সূচিত বিপ্লব সফল করার জন্য জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করা ছিল একটি অনিবার্য দাবি। সুতরাং তারা হাল না ছেড়ে দিয়ে নবতর কৌশলে জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করার চেষ্টা করে। এবারে সুবেদার সারোয়ার, জিয়াউর রহমানকে গিয়ে বলেন, "স্যার, কর্নেল তাহের আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর নেতৃত্বেই

www.pathagar.com

বিপ্লব হয়েছে। আপনি মুক্ত হয়েছেন। চলুন স্যার তাঁর সাথে দেখা করে আসবেন।" জিয়াউর রহমান আবেগের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেন "তাহের আমার বন্ধু। সে কোথায়? তাঁকে এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে চলে যেতে হয়েছিল। তাঁকে এখনই এখানে নিয়ে এস। তিনি এই ক্যান্টনমেন্ট থেকেই সিপাহী-জনতার নেতৃত্ব দেবেন। তিনি তোমাদের নেতা, আমারও নেতা। তিনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। এখনই চলে যাও নিয়ে এস তাঁকে এখানে।"[১৮] জিয়ার উপস্থিতবুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা এবারও জিয়াকে বাঁচিয়ে দেয়। পরে তারা আসে জিয়াকে রেডিওতে ভাষণ দেবার নাম করে শহরে নিয়ে যেতে। এবারের অভিযানে নেতৃত্ব দেন কর্নেল তাহেরের ভাই আবু ইউসুফ। জিয়া ইতস্তত করছিলেন। সেখানে ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল এ জেড এম আমিনুল হক, বীর উত্তম, ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী বীর উত্তম উপস্থিত ছিলেন। কর্নেল আমিনুল হক প্রস্তাব করেন যে, একটি রেকর্ডিং ইউনিট এখানে এনে জিয়ার ভাষণটি রেকর্ড করা হোক। জিয়ার প্রতি গভীর আস্থাশীল এই সামরিক অফিসারের হস্তক্ষেপে এবারও জিয়া বেঁচে যান।

ইতোমধ্যে কর্নেল তাহের— জিয়া সাক্ষাতকার এবং কোলাকুলি হয়ে গেছে। কিন্তু কর্নেল তাহের যখন বুঝতে পারেন জিয়া তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন তখন বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেন এবং গোটা সামরিক বাহিনী ও সামগ্রিক অর্থে আবার অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ৭ নভেম্বর সকালের দিকেই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিয়া শহীদ মিনারে আয়োজিত সৈনিক জনতার সভায় ভাষণ দিতে অস্বীকার করেন। তিনি কারারুদ্ধ মেজর জলিল, আ স ম রব সহ সকল নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেন। সকাল ১১টায় Second Field Artilery সদর দফতরে অনুষ্ঠিত সভায় কর্নেল তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি উত্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল তোওয়াব, কমোডর এম এইচ খান এবং মাহবুব আলম চাষী। কিন্তু কেউই এই দাবিনামার প্রতি কোন আগ্রহ দেখাননি। ফলে কর্নেল তাহের আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর জনশক্তিকে জিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আবার লিফলেট বিতরণ করা হয়। অস্ত্র সমর্পণ না করার এবং সেনানিবাসে ফিরে না যাবার আহবান জানানো হয়। এবার লিফলেটের ভাষা ছিল ভিন্নতরঃ "আমাদের লক্ষ্য শুধু মাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তন নয়। এই বিপ্লব হচ্ছে গরীব শ্রেণীর পক্ষে। আমরা আপনাকে (জিয়া) এই বিপ্লবে নেতৃত্বে বসিয়েছি সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য। আপনাকে অত্যন্ত স্পষ্ট

www.pathagar.com

করে বলতে হবে আপনি গরীব শ্রেণীর পক্ষে। আপনাকে অবশ্যই সেনাবাহিনীর কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে।"[১৯] সকাল ১১টার সময় অনুষ্ঠিত নীতি নির্ধারণী সভায় প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ। যেহেতু সৈনিকদের একটি অংশ খোন্দকার মোশতাকের পক্ষে শ্লোগান দিয়েছে এবং তাঁর ছবি নিয়ে মিছিল করেছে মাহবুব আলম চাষী প্রস্তাব করেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকেই পুনর্বহাল করা হোক। কর্নেল তাহের ও জেনারেল খলিল এতে ঘোরতর আপত্তি জানান। সায়েম তখনও প্রেসিডেন্ট। অন্যরা মুখ খুলছিলেন না। সিদ্ধান্তের জন্য সবাই অবশেষে জিয়ার দিকে তাকান। জিয়া সায়েম এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। সুতরাং খোন্দকার এর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। জিয়াকে যখন C.M.L.A' করার প্রস্তাব করা হয় জেনারেল খলিলুর রহমান এবং কর্নেল তাহের warrant of precedence এর প্রশ্ন তুলে তাতে আপত্তি জানান। অবশেষে জিয়াকে D.C.M.L.A হতে হয়। যদিও ইতোপূর্বে তাকে C.M.L.A' ঘোষণা করা হয়।

৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর দু'জন সঙ্গী নিহত হওয়া ব্যতীত রক্তপাতের তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তাহের পন্থীরা জিয়ার বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করতেই শ্লোগান উত্থিত হয় 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই-অফিসারের রক্ত চাই' 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই সুবেদারের উপরে অফিসার নাই' 'বেঈমান জিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক সাথে' ইত্যাদি। ৮ নভেম্বর সকালে তাহের পন্থীরা অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং ১২ জন অফিসারকে হত্যা করে। তাহেরপন্থীরা অফিসারদের বিতাড়িত করে, ব্যাজ কেড়ে নেয়, অফিসার্স কোয়ার্টারে লুটপাট চালায়। এমন কি তারা এসব কাজের জন্য জাসদ তথা গণবাহিনীর লোকদের সেনানিবাসে নিয়ে আসে। জিয়া এবং জিয়াপন্থী সৈনিকদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন কর্নেল তাহের। অবশ্য ইতোমধ্যে তাহেরপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কর্পোরাল হক এর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ তাহের এর ধ্বংসাত্মক কাজের বিরোধিতা করেন। মেজর জলিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাহেরের এসব অপকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[২০] তারা পরবর্তীকালে ২৩ নভেম্বর সারাদেশে সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু এর আগেই কর্নেল তাহের এবং তাঁর অনুগামীদের গ্রেফতার করা হয়। সেই সাথে সমাপ্ত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ঝঞ্ঝাবহুল দিনগুলোর। ৭৬ সালের ১৭ জুলাই কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু ৭৫-৮১ সাল পর্যন্ত যে ৫টি প্রতি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতিটিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাহেরপন্থীদের হাত ছিল।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর পরবর্তী ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম মোকাবিলায় জিয়াকে হিমশিম খেতে হয়। এ সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত অফিসার তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা না করলে পরিস্থিতি ভিন্নতর হতে পারতো। ঢাকা ব্রিগেডের শাফায়াত জামিলের পরেই যার অবস্থান ছিল তিনি হলেন তৎকালীন কর্নেল বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এ জেড, এম, আমিনুল হক বীর উত্তম। তিনি ঢাকা সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যশোর ব্রিগেডের অধিনায়ক তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার পরবর্তীকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী তার কিছু অনুগত সৈনিকদের নিয়ে জিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এছাড়া কর্নেল ফারুক রশিদের অনুগত সৈন্যরা অন্য কোন বিকল্প না থাকায় জিয়ার প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে জিয়াকে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে সৈনিকদের মধ্যে জিয়ার একটি ব্যক্তিগত ইমেজ এবং ক্যারিশমা ছিল। ৭ নভেম্বর এবং পরবর্তীকালে সেনা ছাউনীগুলোতে শান্তি ও শৃংখলা আনয়নে জিয়ার ঐ ইমেজ তড়িৎ কাজ করে। সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বের এই সব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে জিয়া প্রকারান্তরে দেশ ও জনগণের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ান। যদি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা না যেত তাহলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতে পারতো। তাই বিশ্লেষকরা সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেন "It was Zia himself who saved the Army from an impending doom."[২১]

৭৫ এর ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আজও জাতির কাছে রহস্যময়। খালেদ মোশাররফ একটি আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ভারত বিরোধী ছিলেন এবং কখনো কখনো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যও করেছেন।[২২] ১৫ আগস্ট সকালে তিনি অভ্যুত্থান নেতাদের অভিনন্দন জানান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেন।[২৩] আগস্ট অভ্যুত্থান নেতৃবৃন্দ খালেদ মোশাররফ এর পক্ষে সাফাই বক্তব্যও রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে তা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করেও তাঁকে 'Dubious' 'Oscillating' বলে মন্তব্য করেছেন। তারা অনেকেই তাকে 'Over ambitious' বলে মন্তব্য করেছেন।[২৪] ৩ নভেম্বর-এর অভ্যুত্থানে তিনি জ্ঞাতসারে অথবা নিজের অজ্ঞাতে একটি সম্প্রসারণবাদী শক্তির পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

www.pathagar.com

Foot Notes :

1. S. P. Huntington, Political order in changing societies, (Yale University press, New Haven, 1968) P, 196.
2. Bertocci, J. Peter.," Bangladesh in the early 1980s-Praetorian Politics in an Intermediate Regime", Asian Survey, 10 October, 1982 PP, 992-994. Emajuddin Ahemed, Military Rule and the Myth of Democracy (UPL, Dhaka, 1968) P. 56. Also Mijanur Rahman Shelly," Political Development and Nation Building in Bangladesh." in Hafiz and Rob, (eds) Nation Building in Bangladesh (BIISS. Dhaka, 1986) P. 186.
3. Edward Fiet, Armed Bureaucrats, (Houghton Miffin, Boston, 1973) P.5.
4. Emajuddin Ahamed, Military. Rule and the Myth of Democracy (UPL, Dhaka, 1988) P, 80.
5. Editorial Comment in the Ittafaq on 8 November, 1975
6. Emajuddin Ahmed, Ibid. P. 80.
7. Abul Mansur Ahamed, End of a Betrayl and the Restoration of Lahore Resoletion, (Khoshroje Kitab Mahal, Dhaka, 1975)
8. For details see, Amlendu Dee, Bangali Budhijibi Bichinatabad (west Bengal State Book Board, Calcutta, 1987)
9. Hamja Alavi, The State in Post Colonial Societies : Pakistan and Bangladesh, New Left Review No. 74, July-August, 1972.
10. For details see : M. G. Kabir, "post 1971 Nationalism in Bangladesh: Search for a new Identity" in Hafiz & Rob (eds) Nation Building in Bangladesh (BIISS, Dhaka, 1986) PP. 40-60. also see, S. A. Siddiqui, Pattern of secularism in Bangladesh and India (s.A. Siddiqui, Chittagong, 1975)
11. For details see, Md. Abdul Latif, Role of the Military in politics. A Politicial Study of Zia Regime, Unpublished Ph.D. dessertation, Jadavpur University, 1990. PP 47-51.
12. This portion of the article is summerised from the statements of active participants and available literature after a cautious review.
13. Interview with corporal (Retd) Shamsul Haque, a JSD activist in the defence force on 9 December, 1981 in Dhaka.
14. Larence Lifschultz, Bangladesh the Unfinished Revolution (Zed Press, London, 1979) P. 119
15. Interview with Subedar (Retd) Shamsul Alam Siddiqui (Bir Protik) president, prakton Sainik sangstha on 1 december, 1989 in Dhaka.
16. From the Unpublished memoirs of Hasanul Huq Inu.

www.pathagar.com

17. Marcus Franda, Unpublished interview with Ziaur Rahman.

18. Op. cit. P. 16.

19. Preamble of the circulated leaflet collected in courtesy of Humayun Kabir Hiru Ex M. P. JSD Rob Leader.

20. Corporal Shamsul Huq, Ibid.

21. Marcus Franda, Bangladesh : The First Decade (South Asiam Publisher, New Deilhi, 1982) P, 258.

22. Quoted in B.K. Jahangir's Problematics of Nationalism (C.S.S. Dhaka, 1986) P. 53.

23. Interview with Col. (Retd) Faruq Rahman, on 15th April, 1989 in Dnaka at his Residuce.

24. Interview with col. Younus, 30 October, 91 in Dhaka.

25. ইয়াসিফ আকবর, 'জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপুব বিজয়', পূর্ণিমা ৬ মার্চ, ১৯৯১, আরও দেখুন 'জয় বাংলার বিরুদ্ধে জিন্দাবাদের বিজয়' নিজস্ব ভাষ্যকার, ইনকিলাব, ৭ই মার্চ, ৯১, 'আসাদ উল্লাহ চৌধুরী, নির্বাচনোত্তর কিছু কথা,' মিল্লাত ৬ই মার্চ, ৯১, আরিফ মোহাম্মদ, 'বাংলাদেশের নির্বাচন, আদর্শের সংগ্রাম,' মিল্লাত, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ৯১, নিজস্ব প্রতিবেদন বি,এন,পি'র মিরাকল ভিক্টোরী, বিক্রম, ৩০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, মাহফুজ পারভেজ, 'বিজয়ের প্রেক্ষাপট ও পরাজয়ের ইতিবৃত্ত, রোববার, ৩রা মার্চ, ৯১, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "ধর্মের নামে নির্বাচন" বিচিত্রা, ১২এপ্রিল (ঈদ সংখ্যা) ১৯৯১।

www.pathagar.com

৩

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল

বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

ক. যে কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতাবলয়কে নৈতিক এবং আইনানুগ ভাবে সুসংহত করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কর্তৃত্বের উৎস যদি 'সম্মতি' না হয়ে 'শক্তি' হয় তাহলে এই তাগিদ আরও প্রবলভাবে অনুভূত হবে। যে কোন দেশের সামরিক শাসনের ক্ষেত্রে এই প্রপঞ্চটি অধিকতর কার্যকর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথাগতভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন নাই সত্য, তবে তাঁর ক্ষমতার উৎস বা কর্তৃত্বের প্রাথমিক নির্ভরশীলতা যে সামরিক বাহিনী ভিত্তিক ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। ১৯৭৫ সনের ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানের পটভূমিতে 'তৃতীয় ব্যক্তিত্ব' হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। সাধারণ সৈনিক ও সাধারণ মানুষের সাধারণ সদিচ্ছার প্রতিভূ হিসাবে তিনি ক্ষমতাসীন হন।

যেহেতু তিনি একটি রাজনৈতিক ব্যাকরণ বহির্ভূত সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে 'নেতৃত্বের সঙ্কটাপন্ন'[১] জাতির তাৎক্ষণিক নেতৃত্বে বরিত হন সেজন্য খুব সঙ্গত ভাবেই পরবর্তীকালে তিনি তার শাসনব্যবস্থাকে 'ব্যারাক' থেকে 'বুথে' নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাকে এভাবে সৈনিক সাধারণ থেকে জনসাধারণ্যে নিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিশেষ্য বিশ্লেষণে বিভূষিত। যেমনঃ সামরিক বাহিনীর লোকেরা একে 'গণতন্ত্রায়ন' বলেন। সামরিক বাহিনী বিরোধী লোকেরা বলেন 'সুশীল সমাজের সামরিকীকরণ' কেউ বা বলেন 'ক্ষমতা সুসংহতকরণ প্রক্রিয়া' রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা বলেনঃ 'বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া'।

বক্ষমান নিবন্ধে আমরা ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান অনুসৃত অনুরূপ নীতিমালার অনুশীলন পর্যালোচনা করে দেখবো।

খ. একজন সামরিক শাসক বা শক্তিধর নেতা তার ক্ষমতাকে সুসংহত এবং নিরাপদ করার জন্য নানাধরনের রণকৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। যে সমাজ যে

www.pathagar.com

সময়ে এবং পরিবেশ পরিস্থিতিতে ঐ শাসক অবস্থান করেন তার রণকৌশল সে নিরিখেই নির্ণীত হয়।[২]

আমরা আগেই বলেছি অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ এর শেষদিকে বাংলাদেশের 'শক্ত মানব' বা অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। অসীম সাহস কঠিন ধৈর্য্য এবং প্রবল পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ধ্বংসন্মুখ সেনাবাহিনীকে রক্ষা করেন।[৩] তাঁর এই কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. সৈনিক নেতা হিসাবে (৭নভেম্বর'৭৫-২১ এপ্রিল ১৯৭৭)

খ. জাতির নেতা হিসাবে (২১এপ্রিল ৭৭-৩০ মে ১৯৮১)

উপপ্রধান বা প্রধান সামরিক শাসক হিসাবে প্রাথমিক ১৮ মাস তিনি সেনাপ্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা অব্যাহত রাখেন। অবশ্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ৭ নভেম্বর '৭৫ ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনিই ছিলেন এই জাতির কর্ণধার। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সৈনিক জিয়া সরাসরি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন।

অবশ্য ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট সায়েম দায়িত্ব পালনকালে জিয়া এবং তাঁর পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সরকার 'রাজনীতির ভবিষ্যত দ্বার উন্মোচনের জন্য' কতিপয় কার্যব্যবস্থা গ্রহন করেন।

স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন

ঐ সব কার্যব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় সরকারের জন্য যে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া জিয়া এবং তাঁর নতুন সরকারের রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যও এর সাথে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সব নির্বাচন তৃণমূল পর্যায়ে হওয়ার কারণে সবসময়ই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের উত্থান। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ সব নির্বাচনে ৭৭% পুরনো

www.pathagar.com

ধারার রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ২১%মধ্যপন্থী এবং মাত্র ১% বামধারার লোক নির্বাচিত হয়।[৪] ডান ধারার এই বিপুল বিজয় জিয়াউর রহমানের পরবর্তী রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে মূল্যবান অবদান রাখে।

পি.পি.আর

১৯৭৫ সালের আগষ্ট এবং নভেম্বরের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তথা সামরিক এলিটরা বুঝতে পারেন যে, রাজনীতির 'দামাল ঘোড়া' বেঁধে রাখা যাবে না। তাই তাঁরা ঘোড়ার নাকে লাগাম পড়াবার চিন্তা করতে থাকেন। ১৯৭৬ সালের ২৮জুলাই সরকার একটি অধ্যাদেশ ঘোষণা করে। এটি 'পলিটিকাল পার্টি রেগুলেশন' বা রাজনৈতিক দল বিধি সংক্ষেপে 'পিপিআর' বলে পরিচিতি অর্জন করে। বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ নিবন্ধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করবে। প্রায় একশত রাজনৈতিক দল অনুমতির জন্য দরখাস্ত করে। আওয়ামী লীগসহ ৭২টি রাজনৈতিক দল অনুমোদন লাভ করে। ৭৫ এর আগষ্টের ঘটনাবলীর পরে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনে পিপিআর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

ঘরোয়া রাজনীতি

পি.পি আর এর অধীনে যে সব রাজনৈতিক দল অনুমোদন লাভ করে তারা সীমিত রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি লাভ করে। তবে এই তৎপরতা কেবলমাত্র ঘরোয়া পর্যায়ে সীমিত থাকে। তখনও রাজনৈতিক তৎপরতার উপর সামরিক বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়নি। ঘরোয়া রাজনীতি বা 'ইনডোর পলিটিক্স' কে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর পূর্বাভাস বলে গণ্য করা হয়। 'ঘরোয়া রাজনীতি' পর্যায়ে শাসক এবং বিরোধীপক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহ ব্যঞ্জক রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে।

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আবু সা'দত মোহাম্মদ সায়েম পদত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণের অব্যবহিত পরে জনগণের আশা আকাংক্ষা এবং গভীরতম অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে এবং ইতোপূর্বে গৃহীত কার্যব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতির ব্যাপক পরিবর্তনের ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের মৌল পরিবর্তন

এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সংযোজন বিয়োজনের ঘোষণা দেয়া হয় ঃ

১. শাসনতন্ত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হয়।

২. রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' পরিত্যাগ করা হয়।

৩. আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা এবং সার্বিক বিশ্বাসের কথা ঘোষিত হয়।

৪. সমাজতন্ত্র শব্দের গতানুগতিক তথা মার্কসীয় ব্যাখ্যা বর্জন করা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার হিসাবে সমাজতন্ত্র নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

৫. নাগরিক পরিচিতির ক্ষেত্রে 'বাংগালী' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দ গৃহীত হয়। অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা হয়।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী এতে সন্তোষ প্রকাশ করে যা পরবর্তী কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরাও পরিবর্তনকে যৌক্তিক বলে ব্যাখ্যা করেন।

গণভোট

এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও জিয়া গৃহীত অন্যান্য কার্যব্যবস্থার উপর জনগণের সমর্থন আছে কিনা এটি যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সামরিক শাসকদের মতো একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। ১৯৭৭ সালের ১মে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের ব্যালটপত্রে প্রশ্নাকারে উত্থাপিত হয় যে "জিয়া এবং তাঁর সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের উপর আপনার আস্থা আছে কি না?" হ্যাঁ, না উত্তর দিতে বলা হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, জিয়া ৯৮.৮৮% ভোট লাভ করেন। এই অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যানের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন প্রবীণ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান[৬] মন্তব্য করেন যে, জাতীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জিয়া ব্যাপক আস্থা ভোট লাভ করেন এটা ছিল নিশ্চিত। "রাজা যা বলে পরিষদ বলে তার শতগুণ" প্রবণতার কারণে অতি উৎসাহী আমলা, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জিয়া সমর্থকরা জিয়ার বিশ্বাস যোগ্য সমর্থনকে অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যানে পরিণত করে। এই গণ ভোটে জিয়া ডান এবং বাম প্রায় সকল মহলের সমর্থন লাভ করেন।

১৯ দফা কর্মসূচি

গণভোটের ব্যাপক আস্থালাভের পর রাজনীতি সম্পর্কে জিয়া আরও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। ভবিষ্যত রাজনৈতিক লক্ষ্য বিবেচনা করে ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল ১৯ দফা কর্মসূচি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ঘোষণা করেন। ঘোষিত কর্মসূচিতে মুক্ত

www.pathagar.com

অর্থনীতি, বিরাষ্ট্রীয়করণ গ্রাম উন্নয়ন দারিদ্র দূরীকরণ স্বনির্ভরতা অর্জন, খাল খনন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধের মতো জনপ্রিয় কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

রাজনৈতিক দল গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস জাগদল

প্রেসিডেন্ট জিয়া গণভোটে ব্যাপক আস্থালাভ করার পরও দ্বিধান্বিত ছিলেন যে, তিনি কি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন নাকি পুরনো কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করবেন। জিয়া ক্রমশই জনতার কাতারে শামিল হতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে পেশাগত অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন। একটি কার্যকর রাজনৈতিক দল গড়বার জন্য মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশুকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ডানবাম নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক যোগাযোগ শেষে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে প্রধান করে একটি রাজনৈতিক দল দাঁড় করানো হয়। খ্যাতিমান চিকিৎসক রাজনীতিবিদ অধ্যাপক এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী দলটির নাম দেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল সংক্ষেপে 'জাগদল'। প্রেসিডেন্ট জিয়া সরাসরি যোগদান না করে আরও রাজনৈতিক পরিপক্ক পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। মূলত জাগদল গঠন ছিল একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে শাসকপক্ষের অনুকূল জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়। জাগদল গঠনে জিয়া বিরোধী শিবিরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষের এই প্রাক প্রস্তুতি লগ্নে অনুকূল পরিবেশ ভেবে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন হিসাবে ঘোষিত হয়। এই নির্বাচনী ঘোষণায় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক সমীকরণ ঘটে। ডানবাম এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো রীতিমত দু'পক্ষে ভাগ হয়ে যায়। বিশেষ করে সনাতনী প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ তথা ধর্মনিরপেক্ষ এবং মুসলীম লীগ তথা ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জোট এবং পাল্টা জোট গঠনের তৎপরতা পরিদৃষ্ট হয়। কষ্টকর সাংগঠনিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পর প্রেসিডেন্ট জিয়া বিভিন্ন ধারার একটি সমন্বিত রূপ দিতে সক্ষম হন।

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টগঠনের মধ্য দিয়ে ঐ সমন্বিত প্রয়াসের প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরীক দল গুলো ছিল ঃ

www.pathagar.com

১. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ/ভাসানী) মশিউর রহমানের নেতৃত্বে দলের বৃহৎ অংশ।

২. মুসলীম লীগ (শাহ আজিজ গ্রুপ)

৩. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউ. পি. পি)

৪. লেবার পার্টি (মাওলানা মতিন গ্রুপ)

৫. তফশিলী ফেডারেশন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষিত হন। ফ্রন্টের বাইরে থেকে সাবেক জামায়েত ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং পিডিপি সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী ডেমোক্রাটিক লীগ (আই ডি এল) প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সমর্থন দেয়। তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি পিকিংপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলও জিয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাম ধারার বিশিষ্ট সাংবাদিক হলিডে সম্পাদক এ.জেড.এম. এনায়েতউল্লাহ খান জিয়ার বিজয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রথমদিকে সামরিক শাসনের অধীনে কোন নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠীর সাথে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে জিয়াকে সমর্থন দেয়।

অপরদিকে, জিয়া তথা সামরিক শাসন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের নায়ক জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীকে তাঁদের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে। তাঁরা গণ ঐক্য জোট নামে মোটামুটি বাম ধারার একটি শক্তিশালী জোট গঠনে সক্ষম হয়। গণঐক্য জোটের শরীক দলগুলো ছিলঃ

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)

৩. বাংলাদেশ গণ আযাদী লীগ।

৪. জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানীর নেতৃত্বাধীন)

৫. পিপলস লীগ।

নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পাটি (সিপিবি)নিষিদ্ধ থাকায় এটি আনুষ্ঠানিকভাবে জোটভুক্ত হয়নি। তবে পরোক্ষভাবে তারা জোটকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে।

নির্বাচনী ফলাফল

সামরিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে নৈতিক এবং আইনগত ভিত্তি দেবার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ নির্বাচন পরিচালিত হয়। বার্মার জেনারেল নেউইন,

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল সুহার্তো এবং পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এবং বাংলাদেশের জেনারেল জিয়াউর রহমান একই উদ্দেশে নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের এ নির্বাচনটি একটু ভিন্নধর্মী ছিল একটি কারণে যে, অন্যত্র সকলক্ষেত্রে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য 'মৌলিক গণতন্ত্র' ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হলেও জিয়া তা করেননি। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অত্যন্ত খোলামেলা পরিবেশে গ্রহণযোগ্য ভাবেই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটারের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৩,৮৪,৮৬,২৪৭ জন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ৫৩.৫৯% ভোটার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে জিয়া ৭৬.৬৭% এবং আওয়ামী ২১.৭০% ভোট লাভ করেন। বাকী ১.৬৩% ভোট অন্যান্য প্রার্থীরা লাভ করেন। জিয়ার নির্বাচনী বিজয়ের কারণ হিসাবে একটি তথ্যমূলক পর্যবেক্ষণে বলা হয়, "The objective situation then prevailing was much more favourable for general Zia than for general Osmany."[৪]

বেসামরিক প্রাধান্যে মন্ত্রীসভা

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়া আনুষ্ঠানিক বৈধতা অর্জন করেন এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময় অতিক্রম করেন। নব গঠিত জিয়া ক্যাবিনেটের পেশাগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. রাজনৈতিক নেতা		১৩ জন
দল বিভাজন ঃ		
১. ভাসানী ন্যাপ	–	৩ জন
২. মুসলীম লীগ	–	২ জন
৩. ইউপিপি	–	২ জন
৪. তফশিলী ফেডারেশন	–	১ জন
৫. অন্যান্য	–	৫ জন
খ. টেকনোক্রাট	–	৮ জন
গ. সামরিক ব্যক্তিত্ব	–	৬ জন
ঘ. বেসামরিক ব্যক্তিত্ব	–	২ জন
সর্বমোট	–	২৯ জন

www.pathagar.com

ইতেপূর্বে গঠিত দুটো উপদেষ্টা পরিষদে সামরিক, বেসামরিক আমলা ও টেকনোক্রাটদের প্রাধান্য ছিল। বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রাধান্য শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের নয়, প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যত্রও অনুভূত হয়। সামরিক আদালতগুলো গুটিয়ে নেয়া হয়। সচিবালয় কর্পোরেশন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বেসামরিক লোকদের অধিকতর অবস্থান সুদৃঢ় হয়। অবশ্য সামরিক বাহিনীর যেসব লোকজন পুলিশ বাহিনীসহ অন্যত্র আত্মস্থ করা হয় তাদের প্রত্যাহার করা হয়নি। অবশেষে সামরিক আইনও প্রত্যাহার করা হয়।

বি.এন.পি. গঠন

একটি সফল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জিয়া নিজ রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুসংহত, সমন্বিত এবং আরও ব্যাপকতর করার জন্য একটি একক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফ্রন্ট যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যথেষ্ট নয়, অতীতের 'যুক্তফ্রন্ট' এর ইতিহাস থেকে তিনি সে শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া যে ফ্রন্ট এর মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছেন সে ফ্রন্টকেই একটি রাজনৈতিক দলের রূপ দিতে অগ্রসর হন। সংসদীয় নির্বাচনের আগাম ঘোষণা এসব রাজনৈতিক দলকে জিয়ার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে সহায়তা করে। জিয়া আরও অনুভব করেন বিরুদ্ধবাদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং আদর্শগত ঐক্যের কাছে তাঁর অনুপ্রেরণার ইতোপূর্বে সৃষ্ট 'জাগদল' অথবা ফ্রন্ট কোনটিই টেকসই নয়। ছোট খাটো বিরোধিতা বাদে একরকম সহজেই জিয়া ফ্রন্টকে পার্টিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। 'জাগদল' এবং ফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দল কিছু বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাগত ব্যক্তিত্ব নবগঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপি তে যোগ দান করেন।

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে দেখা যায় 'Right from the left and left from the right' বিএনপিতে এই ধরনের মধ্যপন্থী রাজনৈতিক এলিটদের বিপুল সমাবেশ ঘটে। এতে জিয়াউর রহমানের মননের কাছাকাছি অবস্থান অর্জিত হয়। অর্থাৎ জিয়ার পক্ষে একটি 'centrist' ভূমিকা নেয়া সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ১৯৭৮ সালের ১সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান বিএনপিকে তুলনা করেছেন তুরস্কের পিপলস রিপাবলিকান পার্টি, মেক্সিকোর ন্যাশনাল রেভুলেশনারী পার্টি, দক্ষিণ কোরিয়ার গণতান্ত্রিক দল,ফিলিপাইনের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির সাথে।[৯] বলা বাহুল্য সবগুলো রাজনৈতিক দলের

www.pathagar.com

গঠন তথা উৎসভূমি কমবেশি একই রকমের। জিয়াউর রহমান বিএনপি এর মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিতকরণ, পরিচালনা এবং জনমত সংগ্রহে ব্রতী হন।

সংসদীয় নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি জিয়া শাসনের বৈধতা অর্জন করেন। যে কোন সামরিক শাসকের মতো স্থানীয় নির্বাচন, গণভোট, জাতীয় নির্বাচন, রাজনৈতিক দল গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রান্তসীমায় উপনীত হয়। কিন্তু তখনও একটি কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়া হয়নি। ৭৫ এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যে জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘটে তা আর পুনরুজ্জীবিত হয়নি। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এই সমন্বিত ফোরামটির সংগঠন জিয়া এবং তাঁর সহযোগীদের জন্য অনিবার্য ছিল। প্রায় চার বছরের দূরদৃষ্টি রাজনৈতিক কার্যক্রমের পর একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বিএনপি এর আত্মপ্রকাশের পর জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ৩৩ দিনে "The political situation appeared to have stabilized substanfially[10] সংসদীয় নির্বাচনে সকল দল ও মতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য জিয়া চেষ্টিত হন। এ সময় সামরিক শাসক বিরোধী আন্দোলন ও দানা বেঁধে ওঠে। প্রকাশ্য ও গোপনে কষ্টকর রাজনৈতিক অনুশীলনের পর তিনবার তারিখ পিছানোর পর নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সরকার বিরোধী পক্ষের তিনটি দাবি

(i) সামরিক আইন প্রত্যাহার

(ii) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও

(iii) সকল রাজবন্দীদের মুক্তি।

দাবিগুলো নীতিগত ভাবে মেনে নেয়া হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দেয়।

খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রাটিক লীগ এবং জেনারেল ওসমানীর জনতা পার্টি এ নির্বাচনকে 'সামরিক শাসন বৈধকরণ প্রক্রিয়া' বলে অভিহিত করে তারা এ নির্বাচন বর্জন করে।

www.pathagar.com

নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	শতকরা ভোট	মন্তব্য
বি.এন.পি	২৯৮	২০৬	৪১.২	শাসক দল
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	১৪.৪	প্রধান বিরোধীদল
মুসলিম লীগ				
আই. ডি এল	২৬৫	১৯	১০.০	ইসলামপন্থী
জাসদ	২৪০	০৯	৪.৯	অতি বামপন্থী
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৩	০২	২.৮	মূল আওয়ামীলীগ এর ভগ্নাংশ
অন্যান্য	৪১৯	০৭	১.৭	প্রধান বামঘেঁষা
স্বতন্ত্র	৪২৫	১৭	১২.৯	------

(সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন)

এ নির্বাচনে ৫০.৯৪% লোক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ১৭ জন স্বতন্ত্র এম পি এর ১০ জন বিএনপিতে যোগ দান করেন। একজন গবেষক মন্তব্য করেন যে, The massive victory of the BNP underlined the continuced confidence of the public in the leadership of President Zia, the soldier turned politician.[11] মাত্র ৫ মাস বয়সী বিএনপি এর জন্য এটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়। জিয়ার এই বিজয়ের কারণ হিসাবে ৫টি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়।

১. আমলাতন্ত্রের নিঃশর্ত সমর্থন এবং জনসমর্থন সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা,

২. নব নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের বলিষ্ঠ ভূমিকা।

৩. মধ্য এবং ডান তথা ইসলামপন্থীদের সমর্থন।

৪. সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমসমূহের প্রচারণা।

৫. বিরাজমান পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের সঙ্কট।

তবে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল বিরোধীদল নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি জালিয়াতি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ আনয়ন করেন।[১২]

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধীদলের অভিযোগের সত্যতা থাকতে পারে। তবে ব্যাপক কারচুপি বিএনপি এর সার্বিক বিজয়ের কারণ ছিল না। ইতোপূর্বে তা বলা হয়েছে। ৭৫ পরবর্তী সময়ে জিয়া এবং তার অনুগামীরা জনচিত্ত জয় করার জন্য বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও উন্নয়নমূলক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঐ সব কার্যব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মন জয় করে।

১৯৭৯ সনের সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান তাঁর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছান। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট গবেষকরা জিয়ার এই তড়িৎ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানান। ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বি ঘোষাল মন্তব্য করেন ঃ

"He (Zia) withdrew martial law, Civilianized the Government, set in nation a parliament allwoed open political activities and become a civilian himself, The whole paraphernalia was, however, democratic in form but authoretarian in content."[13]

পপুলিষ্ট প্রোগ্রাম

জিয়াউর রহমান শুধুমাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তাঁর বেসামরিকীকরণ বা ক্রমাগত ক্ষমতা সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বল্‌লে আর একটি সত্য অস্বীকার করা হবে। আর সেই বাড়তি সত্যটি হলো তাঁর কিছু পপুলিষ্ট প্রোগ্রাম (Populist programme)। এই সব পপুলিষ্ট প্রোগ্রামকে তিনি সফলতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রদান করেন। কর্মসূচিগুলো জনগণের শাশ্বত বিশ্বাস, জীবন বোধ ও আশা আকাংক্ষার প্রতিধ্বনি করায় জিয়া সাধারণ মানুষের মনের মনিকোঠায় নিজ স্থান করে নেন। জনপ্রিয় এসব কর্মসূচিগুলোর সংক্ষিপ্ত সার নিচে পরিবেশিত হলো ঃ

ক. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশ যে একটি জনপরিচিতি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল পন্ডিত ও গবেষকরা সে বিষয়ে মোটামুটি একমত।[১৪] বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত ইতোপূর্বের শাসকদের থেকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। চিরায়ত আদর্শ,মুক্তিযুদ্ধ এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে জিয়াউর

www.pathagar.com

রহমান এই মানচিত্রের অধিবাসীদের একটি নতুন পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেন। সে পরিচয় হলো ঃ

আমরা বাঙালী নই, আমরা বাংলাদেশী। জিয়াউর রহমানের নিজস্ব লিখনিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান ১১টি। ১. জনগণ, ২. ভূখন্ড ৩. ভাষা, ৪. ধর্ম, ৫. স্বাবলম্বী অর্থনীতি, ৬. সংস্কৃতি, ৭. মুক্তিযুদ্ধ, ৮. বহিঃশত্রু ভীতি, ৯. জনগণতন্ত্র, ১০. সামাজিক ন্যায় বিচার, ১১. পৃথক সত্তার অনুভূতি, জিয়াউর রহমান এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে দুই বিপরীতমুখী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাঙালী ও মুসলিম জাতিসত্তার উভয়ের মিশ্রণ ও সমন্বয়ের মধ্যপন্থী একটি গ্রহণযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 'মৌলবাদ' ও "উগ্রবাম" দুটোর মাঝামাঝি হওয়ায় জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে। বাংলাদেশে জনগণ ধর্মভীরু কিন্তু মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আবার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকেও মেনে নিতে চায় না– এ ভূখন্ডের এ অনুভূতি জিয়াউর রহমান যতটা সার্থকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন অন্য কোন নেতা তেমন করে বুঝতে পারেননি। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের প্রতি জনগণের সমর্থন প্রমাণ করে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। এমনকি ৯৬এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতারে মোড়কে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল চেতনাকে গ্রহণ করে রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো।[১৬]

খ. স্বনির্ভর আন্দোলন

ক্ষমতালাভের পর থেকেই "স্বনির্ভরতার" আহ্বান ছিল জিয়াউর রহমানের বুনিয়াদী কর্মসূচি। পরবর্তী কালে ১৯ দফা কর্মসূচি' ও বি.এন.পি এর মেনিফেষ্টোতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বনির্ভরতার কথা উপস্থাপিত হয়। নির্বাচন পরবর্তী কালে জিয়া একে "আন্দোলন কর্মসূচি" হিসাবে গ্রহণ করেন। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে এই "স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে" পরিচালনা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবাকে স্বনির্ভরতা আন্দোলনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়।[১৭] কোন রকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই সর্বস্তরের জনসাধারণকে খাল খনন, গ্রাম উন্নয়ন ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল স্বনির্ভরতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে যশোরের "উলসী" গ্রাম থেকে এ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। জিয়াউর রহমান অসংখ্য জনসভা, পায়ে চলা জন সংযোগ এবং প্রচার মাধ্যমে জাতিকে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে পরিচালিত করেন।

www.pathagar.com

স্বনির্ভরতা আন্দোলনের সাথে জিয়াউর রহমান আরও যে সব বিষয় সম্পৃক্ত করেন সে গুলো হলোঃ কৃষি, সেচ, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামকে তিনি এক একটি পৃথক পৃথক "ইউনিট" হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন।

গ. খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণকরণ

খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টিকে জিয়াউর রহমান জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করাকে তিনি স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রথম ও প্রধান সোপান হিসাবে বর্ণনা করেন। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার সাথে তিনি খাল খননের মাধ্যমে জমিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পতিত জমির ব্যবহার, একই জমিতে বারবার রকমারি ফসল ফলানো, স্বল্প সময়ে ফসল উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন, সমবায় ব্যবস্থা জোরদারকরণ, সার আমদানি ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭৯ নভেম্বর মাসে তিনি এটিকে বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসাবে উল্লেখ করেন। এ সব কার্যক্রমের ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংস্বম্পূর্ণতার দিকে অনেকটা এগিয়ে যায়। জিয়া তথা সরকার গৃহিত এই কার্যসূচি দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়।[১৮]

ঘ. খাল খনন কর্মসূচি

বাংলাদেশ গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের উর্বরতম অংশ হওয়া সত্ত্বেও শুকনো মৌসুমে মাত্র ১০% ভাগ জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয়। নদীগুলো পলিমাটি ভরাট ও জমিতে পানি নেয়ার পর্যাপ্ত খাল না থাকার কারণেই এমনটি হয়। আর একটি পরিসংখ্যানে বলা হয় শুধু মাত্র পানি সেচের অভাবে ৬০% ভাগ জমিতে বৎসরে শুধু মাত্র একবার খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। জিয়াউর রহমান এ অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যাপক খাল খননের মাধ্যমে যতটা সম্ভব বেশি জমিতে পানি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ মাইল খাল খননের জন্য ১০৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প সংখ্যা ২৫০ বৃদ্ধি পায় এবং ৯০০ মাইল খান খনন করা হয়। ১৯৮০ সালে খাল খননের লক্ষ্যে সারাদেশে বিপুল উ ৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। জিয়ার মৃত্যুর পরে সে উৎসাহে স্থায়ী ভাটার সৃষ্টি হয়।

ঙ. গণশিক্ষা কর্মসূচি

স্বনির্ভরতার লক্ষ্য অর্জনের পরিপূরক হিসেবে গণসাক্ষরতা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সামনে

www.pathagar.com

রেখে এই কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ৮৫ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ২৮% থেকে ৮০% উন্নীতকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রাম এলাকার বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দান করার সঙ্গে স্বেচ্ছা সেবকদল গঠন, ইউনিয়ন পরিষদ ও ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি (ভি,ডি,পি) কে কাজে লাগানো, এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়ে এটি পরীক্ষা ব্যবস্থার ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে পুরস্কার ঘোষিত হয়। সরকারি হিসাবে বলা হয় ঐ সময় ২৭ লক্ষ লোককে পড়তে ও লিখতে শিখানো হয়।

চ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

জিয়াউর রহমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমূহ বিপদ অনুধাবন করে এটিকে জাতির ১নং সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে জিয়াউর রহমান প্রকাশ্যে জনসভায় ও গণ-মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রতিরোধের আহ্বান জানান। তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে অব্যাহতভাবে সতর্ক করতে থাকেন। জিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% থেকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা করেন। জনসংখ্যা রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁর সময়ই 'এক ছেলে এক মেয়ে' ধারণা 'নীতি ও আদর্শ' হিসাবে প্রচারিত হয়। এছাড়া বিলম্ব বিবাহ একাধিক বিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ গণমাধ্যমের ব্যাপক পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সম্প্রসারণ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। এ সব কার্যক্রমের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৩% থেকে জিয়ার শাসনের শেষ বছরে ২.৮% ভাগে নেমে আসে।

ছ. গ্রাম সরকার

কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা সুসংহত করার পর জিয়া এবং তাঁর সরকার তৃণমূল পর্যায়ে তার সমর্থনের ভিত্তি শক্ত এবং স্থায়ী করার পদক্ষেপ নেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং উন্নয়নের সুফল গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানীয় শাসন কাঠামোর পুনর্গঠন অনিবার্য ছিল। সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিটঃ গ্রামকে আইন ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "গ্রাম সরকার" নামে ৬৮ হাজার গ্রামের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই গ্রামীণ সরকারকে কৃষি, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ, দায়িত্ব বন্টনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। 'স্বনির্ভর' ধারণাকে জনপ্রিয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক করার উদ্দেশ্যে গ্রাম সরকার নামের পূর্বে স্বনির্ভর

www.pathagar.com

শব্দটি সংযোগ করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ এবং স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় এবং তাৎক্ষণিক সমাধানও গ্রাম সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৮০ সালের ৩০ শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে "গ্রাম সরকার" উদ্বোধনের তিন সপ্তাহ পর বাংলাদেশ সরকারের এক অতিরিক্ত গেজেটে গ্রাম সরকারের সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে গ্রাম সরকারের পার্লামেন্ট 'গ্রাম সভা' গঠন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন গ্রাম প্রধান এবং দুইজন মহিলাসহ মোট ১১ জন নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়। এর মেয়াদ তিন বৎসর হবে বলে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ১৯৮০ সালের ২১শে জুন জাতীয় সংসদে গ্রাম সরকার বিল উত্থাপিত এবং পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। আগে থেকেই দেশে কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ এবং নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম সরকারের আইনগত এবং আর্থিক সীমা অবস্থান নিয়ে বৈধতা, বিভ্রান্তি এবং গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। গ্রাম সরকার ব্যবস্থা এইসব অসুবিধা দূর করে একটি স্বচ্ছ রূপ নেয়ার আগেই ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে এরশাদ সরকার এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

জ. যুব কমপ্লেক্স

১৯৭৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২% হচ্ছে যুবক। তাদের বয়স ১৫-২২ বছর। হতাশা সন্ত্রাস ও বেকারত্ব আক্রান্ত ঐ বিপুল জনগোষ্ঠীকে জিয়াউর রহমান নতুন আশা আকাংক্ষা ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করতে চাইলেন। তিনি চাইলেন যুবসমাজ চলমান সামাজিক আন্দোলন ও উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে বিকশিত হোক। ১৯৭৭ সালের ১৮ এবং ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার শেরে বাংলা নগরে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় যুব সংস্থাও গঠিত হয়। জিয়া ঘোষিত ঐ সব মহৎ উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে গ্রামে গ্রামে গঠিত হয় যুব কমপ্লেক্স। উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কালোবাজারী, স্বজনপ্রীতি নিরোধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহ ও বিপনণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ। আয়ের বৈধ উৎস হিসাবে হাটবাজার ও ফেরী ইত্যাদির ইজারা দেওয়া হয় এই সব যুব কমপ্লেক্সকে। যে মহৎ উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে গঠিত এই যুব কমপ্লেক্স, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কাজ হয় তার উল্টো। জিয়াউর রহমানের মহৎ উদ্দেশ্যাবলী ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

ঝ. গ্রাম প্রতিরক্ষা দল(ভি. ডি. পি) ঃ

গ্রাম দেশে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবসময়ই অবহেলিত ছিল। "আনসার" বা স্বেচ্ছাসেবক ধরনের একটি অকার্যকর কাঠামো অবশিষ্ট ছিল। জিয়াউর রহমানের ভাষায়, 'সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে গ্রামের মানুষের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সৃষ্টি হয় ভিডিপি।' ১৯৭৬ সালে দেশে যখন নিয়ম শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে তখন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক সেবা গ্রহণের মাধ্যমে এটি সংঘঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক লোককে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। সরকারি দাবি মোতাবেক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ভিডিপি, পুলিশ এবং গ্রামীণ মানুষের মাঝে সংযোগের কাজ করেছিল। জিয়া সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের যে কোন সংগঠন থেকে ভি, ডি, পি এর সফলতা উল্লেখযোগ্য ছিল। সম্ভবত সে কারণেই অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটলে ও ভিডিপি শুধু মাত্র তার অস্তিত্বই বজায় রাখেনি বরং পরবর্তী সরকারগুলোর আমলে এটি আরও সমৃদ্ধি অর্জন করে।

উপসংহার

১. জিয়াউর রহমান একটি সামরিক শাসনকে মোটামুটি বেসামরিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন। ১৯৭৫ থেকে উত্থিত রাজনৈতিক সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতা এই বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অনুকূল ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন ১৯৭৭ সালে নির্বাচনী ঘোষণা দেন তখন বর্ষিয়ান জননেতা মাওলানা ভাসানীসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 'পরিস্থিতি অনুকূল নয়' বলে নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান এবং তাঁর অনুগামীরা তুলনামূলক ভাবে দ্রুততর সময়ে এই বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। অথচ সামরিক আইনের মাধ্যমে আরও কয়েক বছর নির্বিঘ্নে শাসন দন্ড পরিচালনা করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল না।

২. সামরিক শাসকদের বেসামরিক পর্যায় উত্তরণের ক্ষেত্রে সনাতন বিতর্ক এই যে, সামরিক বাহিনী বেসামরিকীকরণ নয়, বেসামরিক ব্যবস্থাকে বরং সামরিকীকরণ করেন। বিতর্কটি অহেতুক নয়। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামরিক বাহিনী স্বাভাবিক শাসক না হওয়ার কারণে এই বিতর্কের সূত্রপাত।

www.pathagar.com

তবে মনে রাখতে হবে কোন দেশ বা সরকারই সামরিক বাহিনী শূন্য বা সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ প্রভাব মুক্ত নয়। অতি উন্নত বিশ্বের ও পররাষ্ট্রনীত নির্ধারণ ও বহিঃ বাণিজ্য পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর পরামর্শ সাদরে গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে, যে দেশটি আবার সামরিক শাসকের কবলে নিপতিত সেদেশে সম্পূর্ণ বেসামরিকীকরণ কাম্য হলেও সম্ভব নয়। তাছাড়া উন্নত সিভিল সোসাইটিতে বেসামরিক কর্তৃত্বের আওতায় কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিক আমলাদের নিযুক্তি এবং অবস্থান প্রথাগত এবং আইনানুগ ব্যবস্থাই বিবেচিত হয়ে আসছে। জিয়াউর রহমান যখন সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন তখন সম্ভাব্য সকল জায়গা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হয়। খুব অল্প সংখ্যক অবস্থানেই সামরিক বাহিনী অবসর প্রাপ্ত অথবা আত্মীকৃত লোকেরা অবস্থান করতে থাকে।

৩. জিয়াউর রহমানের বড় কৃতিত্ব পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে একদলীয় শাসন তথা বাকশাল কায়েম করেছিল সামরিক বাহিনী তা অব্যাহত রাখলে ঐ রাজনৈতিক নেতাদের তেমন কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সমাজের আশা আকাংক্ষা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি জিয়ার সতত স্বীকৃতির ফলেই দেশে আবার বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. দেশ ও বিদেশের তাত্ত্বিকরা তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে নিপাতনে সিদ্ধ একটি ঘটনাকে অকপটে স্বীকার করেন। একজন সামরিক শাসক যত রণকৌশলই আটুন না কেন বৈধতা (Legitimcy) এবং বেসামরিকীকরণে সফল হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। আইউব অথবা এরশাদ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান একটি ব্যতিক্রম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, জিয়াউর রহমান গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে কাম্য বৈধতা (Ligitimacy) অর্জন করেছিলেন।

৫. আসলেই কি জিয়াউর রহমান বৈধতা অর্জন করেছিলেন? বেসামরিকীকরণে সফল হয়েছিলেন? সফলতা অথবা ব্যর্থতার মাপকাঠিতে জিয়াউর রহমানের সময়কাল এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার মাঝেই এর উত্তর খুঁজে নিতে হবে। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে তাঁর দল রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছিল। বিশেষত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন(৭৮) এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭৯) এই গ্রহণ যোগ্যতার বড় প্রমাণ। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যানের হ্রাসবৃদ্ধি বা অতিরঞ্জন ঘটলেও

www.pathagar.com

তার প্রতি জনগণের সার্বিক সমর্থন ব্যাপক ছিল। জিয়াউর রহমানের মৃত্যু এবং তাঁর প্রতি সতত সহানুভূতি জিয়ার উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রথমতঃ বিচারপতি সাত্তারের বিপুল বিজয় পরবর্তীকালে একদশক সময়ান্তরে জিয়া সহধর্মিনীর 'আকস্মিক' বিজয় রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে হতবাক করে দেয়। এসব ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে জীবিত জিয়াউর রহমানের চেয়ে মৃত জিয়াউর রহমান অনেক শক্তিশালী। সেনা ছাউনী থেকে বেড়িয়ে আসার কারণে রাজনৈতিক বৈধতা দিতে যারা জিয়ার বিরোধিতা করেছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন এখনো লক্ষ লক্ষ জনচিত্তে আবেগ এবং আশার প্রতীক হিসাবে, দেশপ্রেম ও উন্নয়নের ধারক হিসেবে. আদর্শ ও উত্থানের প্রতিভূ হিসাবে জিয়া রাজনৈতিক আকাশে স্বমহিমার উজ্জ্বল। সৈনিক রাজনীতিবিদ হিসেবে বৈধতার সঙ্কট কাটিয়ে একটি পথ পরিক্রমা অবশেষে তিনি গোটা জাতিকে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তৈরি করে গেছেন।

www.pathagar.com

Foot Notes.

1. Zillur Rahman Khan, Martial law to Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh, (UPL, Dhaka, 1984)
2. Stanely Hoffman, Political Leadership in Industrial Societies (John Wiley, New York, 1967) PP 108-109.
3. Emajuddin Ahamed, Military Rule and the Myth of Democracy (UPL, Dhaka, 1988)
4. M. Rashidujjaman, Bangladesh 1977: Dilemmas of a Military Ruler, Asian Survey, February, 1978.
5. Iftekharwjjaman and Mahbabur Rahman, "National Identy and Nation Building Perceptions, Problems and An Approach" in Hafiz and Rob (eds) Nation building in Bangladesh (BIISS, Dhaka, 1986) pp, 8-39,
6. Interview with Mozammal Huq, chairiman Ratandi Taltali union Parishad (galachipa, Patuakhali) on 15 November 1989 at his village residence.
7. Source, Elction Commission.
8. Shamsul Huda Haroon, Bangladesh voting Behavior, a Psephological study, 1973. (D.U. Dhaka, 1986) P, 20.
9. Talukder Manirujjaman, Civilianijation of Military Regimes: A comparative Analysis "BIISS JOURNAL (Dhaka) VOL: I. NO I, 1980
10. Ajizul Hoque, "Bangladesh 1979: Cry for a sovereign Parliament" Asian Survey Vol: XX. No. 2 Felruary, 1980, PP,217-230.
11. Syed serajul Islam, Bngladesh: state and Economic Strategy, (UPL, Dhaka, 1988) P, 129.
12. Dainik Sangbad, 20-27 Febreary 1979.
13. Baladas Ghoshal, "Bangladesh: Passege to Military Rule, Foreign Affairs Reports, (New Delhi) VoL. XXXI M:8. August, 1982, PP,139-159.
14. Please see for a sereis of articles relationg to the crisis, Hafiz and Rob (eds) Nation Building in Bangladesh (BIISS, Dhaka, 1986)
15. Ziaur Rahman, "Bangladesh Jatiotabad, Dainik Bangla. 8, July. 1981.
16. For a similar view particularly in the case of Election 1991. syed Anowar Hossain, "Politics in the name of religion", Bicitra. Eid suppliment. 1992.
17. Q.k. Ahamed, Development through self Helf: Hessohs from Vlasi (BIISS, Dhaka, 1978)
18. Far Eastern Economic Review, "Basket case to Bread Basket"
    -Developing world, "Bangladesh Enjoys feast after years of Famine," 1 January. 1981.
    -The christian Science monitor "Ten years ofter Independence, Bangladesh Mars Toward self sufficiency, " 26 March, 1981.

www.pathagar.com

৪

ব্যক্তিজীবন ঃ কিছু অজানা কথা

ক. এই জাতির জন্য যারা পাহাড় কেটে কেটে সমতল পথ তৈরি করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাদের একজন। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় জাতি যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে, সে সময়গুলোতে জিয়াউর রহমানের সাহস, দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টি জাতিকে অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে জাতির একক নেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত জাতিকে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দান করে।

খ. জাতি যে নেতা ও নেতৃত্বের কাছে এত ঋণী, তিনি কিন্তু গতানুগতিক নেতা ছিলেন না। নেতা হয়েই যাদের জন্ম (Born Politician) অথবা রাজনীতিই যাদের পেশা বা নেশা তিনি তাঁদের একজন ছিলেন না। তাঁকে নেতা হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরিচালিত গবেষণা প্রমাণ করে তিনি কখনও 'রাজা' হওয়ার স্বপ্ন দেখেননি। সঙ্কট বা সমস্যা কিছু লোককে তাৎক্ষণিকভাবে নেতৃত্বে বরণ করে। শহীদ জিয়া ছিলেন তেমনই একজন সঙ্কটকালীন নেতা (Crisis Leader)। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একজন রাজার কথা জানা যায়। তাঁকে লোকেরা জোর করে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। তার নাম গোপাল। ইতিহাসে গোপালের যুগ ছিল স্বর্ণ যুগ। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সৈনিক জনতা জিয়ার হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকরা কথাটিকে এভাবে বলেন "He was placed to the power." ক্ষমতার জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। প্রাথমিক শাসক এলিটরা যখন তাঁর জন্য বিব্রতকর কাউকে সেনাপ্রধান বানিয়ে দেয়, তখনও তিনি নীরবে তা মাথা পেতে নেন। আবার তাঁদেরই প্রতিভু খালেদ মোশাররফ যখন অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থান দ্বারা জাতির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলেন, তখন তিনি সব কিছু ফেলে নির্লিপ্ত অজ্ঞাত বাসের বাসনা পোষণ করেন।

গ. কিন্তু যখন দায়িত্ব বর্তায় তখন অসীম সাহসিকতা নিচ্ছিদ্র নিষ্ঠা এবং নিরলস পরিশ্রম দ্বারা তা তিনি সম্পাদন করেন। ১৯৭৫ সালে নভেম্বরের

www.pathagar.com

টালমাটাল ঘটনাবলী সম্পর্কে যারা জানেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন জীবনকে বাজি রেখে তিনি সঙ্কট উত্তরণে সক্ষম হন। ঢাকা ব্রিগেডের তৎকালীন দায়িত্বশীল ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক এক একান্ত সাক্ষাৎকারে দুঃসহ দিনগুলোর কথা বলেছেন। ৭ নভেম্বর পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে পরিবার-পরিজনকে রেখে নিজের আরাম হারাম করে জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মাঝে ব্যারাকেই রাত দিন কাটিয়েছেন।

বিপথগামী সৈনিকরা যখন অফিসারদের হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে তখন তিনি অফিসারদের মরণকে জয় করার সৈনিক জীবন ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের সাথে নিয়ে সশস্ত্র বিক্ষুব্ধ সৈনিকদের ক্ষান্ত করেছেন। পাল্টা অভ্যুত্থানের বুলন্দ আওয়াজও তাঁর ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান হয়ে যায়। তাই বিদেশী গবেষকেরও মন্তব্য ঃ "He saved Bangladesh Army from an impending doom."

ঘ. এভাবে ব্যক্তি জীবন হয়ে ওঠে সামষ্টিক জীবন। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনকে যে ব্যক্তি ভরে তুলেছিলেন বর্ণাঢ্য আলোয়, তিনি সহসাই ভুলে যান আপন ভুবন। নিজের সুখময় জীবন, সন্তানের গৌরবময় ভবিষ্যৎ অথবা সহধর্মিনীর উষ্ণ সান্নিধ্য কোনটিই তাঁকে সরিয়ে নিতে পারেনি। জাতির প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্যই বড় হয়ে দাঁড়ায়। দায়িত্ব ব্যক্তিকে পরিণত করে প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটি হয়ে ওঠে জাতির সার্বক্ষণিক 'কেয়ার টেকার।' তাঁর এই সার্বক্ষণিক তদারকির দায়িত্বকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ সৈনিকদের নেতা, জাতির নেতা।

ঙ. প্রথম পর্যায় ছিল শঙ্কাপূর্ণ ঝন্‌ঝামময় জীবন, দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ দায়িত্বশীল জীবন। সারা জীবন ধরেই তিনি ছিলেন ভোরের পাখী। সাত সকালেই জেগে উঠতেন তিনি। বঙ্গভবনে গিয়েও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং কোন কোন দিন ভোর ৪টায় ওঠতেন। তাঁর সময়ে বঙ্গভবনের ঝানু ঝানু আমলাদের আরামও হারাম হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অনেকেরই দুপুরে একটু ঝিমানোর অভ্যাস। কিন্তু জাতির দায়িত্ব নেয়ার পর এক দিনও কেউ তাঁকে ঝিমোতে দেখেনি। কঠিন কষ্টসহিষ্ণু ছিল তাঁর শরীর। প্রতিদিন সকালে হেলিকপ্টারে করে কোন গহীন গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্রাম-গাঁয়ে গিয়ে মাইলের পর মাইল অনায়াসে হেঁটে যেতেন চির তরুণ জিয়া। কোন খাল খনন কর্মসূচি অথবা উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা উপলক্ষে মিশে যেতেন সহজ-সরলভাবে জনতার মাঝে। তাদের নিজেদের মুখে শুনতে

www.pathagar.com

চাইতেন সুখ-দুঃখের কথা। কখনো কখনো হঠাৎ করেই উপস্থিত হতেন কোন কৃষকের দহলিজে অথবা গরীবের কুঁড়ে ঘরে। এমন অনেক সময় ঘটেছে তিনি সেই সব বাড়ি-ঘরের লোকদের বলতেন ঃ

আমাকে কি খাওয়াবেন? কৈ-গাছে কোন ফলমূল তো দেখছি না? উঠোন ভরা মোরগ-মুরগী তো দেখছি না। অর্থাৎ তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন সুখী সংসারের জন্য, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। জনসভায় অথবা বেতার ভাষণে একই আহবান থাকতো 'গাছ লাগান-পরিবার ছোট রাখুন-আরও ফসল ফলান' ইত্যাদি। এভাবে গ্রামীণ মানুষের সুখের জন্য তিনি গ্রাম বাংলা এক রকম চষে বেড়াতেন। তিনি বাংলাদেশকে যতটা দেখেছেন আর কোন নেতা অতটা দেখেছেন কি-না সন্দেহ। মার্কাস ফ্রান্দার মতো পাশ্চাত্য সাংবাদিকও স্বীকার করেছেন যে 'জিয়া শেরে বাংলা অথবা বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বাংলাদেশকে বেশি করে দেখেছেন।'

চ. জাতির কর্ণধার হিসেবে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন ঠিকই কিন্তু সে সিদ্ধান্তের পেছনে থাকতো অনেক শ্রম ও ভাবনা। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (Decision making process) ছিল সতর্ক এবং পর্যায়ক্রমিক' (Cautious and gradual) জিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনেকে কর্তৃত্ববাদী(Authoritarian) বললেও তাঁর একটি গণতান্ত্রিক অবয়ব (Democratic facade) ছিল। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তিনি বিশেষজ্ঞদের মতামত (Expert opinion) নিতেন। সব ধরনের সব মহলের মতামত জানার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রচুর শুনতেন। বলতেন কম। সময়ের উত্তম ব্যবহার জানতেন তিনি। বিমানে অথবা গাড়িতে তুলে নিতেন তিনি কাউকে, যার কথা তিনি শুনতে চান। বিদেশ ভ্রমণের সময় আকাশের সময়টাও কাটতো এমনিভাবে। দলীয় কর্ম তথা সংগঠনের সকল স্তরের লোকদের কথা শুনতেন তাঁদের মতামতের গুরুত্বও দিতেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বা পরে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সমস্যার ধরন বুঝে মন্ত্রিপরিষদ বা দলীয় কাঠামোতে আলোচিত হতো পুরো বিষয়টি। চমৎকার গণসংযোগ ছিল তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক থেকে শ্রমিক নেতা পর্যন্ত আমন্ত্রিত হতো একান্ত অলোচনার জন্য। বেসামরিক বিষয়ের সাথে সামরিক বিষয় গুলিয়ে ফেলতেন না তিনি। সামরিক বিষয়ে সামরিক সমাধান এবং বেসামরিক বিষয়ে রাজনৈতিক সমাধান ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ছ. আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজনীতিবিদদের স্বজনপ্রীতি তেমন কোন অপরাধ নয়। কিন্তু জিয়াউর রহমান ছিলেন এ

www.pathagar.com

অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর জীবদ্দশায় কোন মামু, খালু বা ভাগ্নের কথা শোনা যায় নি। সেনাবাহিনীতে অবস্থানরত তাঁর শ্যালক ইস্কান্দার এবং তাঁর বসের প্রতি নির্দেশ ছিল যখন-তখন যেন তিনি 'সেনাভবন' বা 'বঙ্গভবন' ভিজিট না করেন। তাঁর একজন মামা ছিল। তাও দেশবাসী তাঁর মৃত্যুর পরে এরশাদের সৌজন্যে জানতে পারে। এমনকি তিনি তাঁর প্রিয় সহধর্মীনীকেও 'ফার্স্ট লেডী' বানিয়ে অর্থ ও মর্যাদার অংশীদার করেননি। ক্ষমতা লাভের পূর্বে জিয়ার ছোট ভাই তাঁর সাথে থাকতেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি তাঁকে বাইরে থাকতে বাধ্য করেন।

'জ. আমরা গল্পে অথবা ইতিহাসে 'ফকির বাদশাহ' বা 'রাজর্ষি'র কথা পড়েছি। কিন্তু এ যুগেও এটি সম্ভব তা জানা যায় জিয়ার জীবন থেকে।

১. মৃত্যু এমনিই একটি নির্মম সত্য যা সব কিছু উলোট-পালট করে দেয়। মৃত্যুর পরে পাপ অথবা পুণ্য এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের পরে তাঁর সহায়-সম্পদ এবং স্থায়ী জিনিসপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তা জনতাকে অবাক করে।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য কোন সঞ্চয় বা 'এক ইঞ্চি' জমিও রেখে যাননি। জীবন অবসানের পর সব কিছু ঘেঁটেঘুঁটে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যা 'ব্যক্তিগত' বলে উল্লেখ করা যায়। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ভাঙ্গা স্যুটকেস বা ছেঁড়া গেঞ্জি কারো কারো কাছে গল্প মনে হলেও ওটাই ছিল নির্মম সত্য। আমাদের রাজনৈতিক পরিবারগুলোর বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও জনতার কাছে এটি একটি বিরল উদাহরণ।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরল সততার আরও কিছু ঘটনা জানিয়েছেন মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী। তিনি দীর্ঘকাল শহীদ জিয়ার সামরিক সচিব ছিলেন। ১৯৮৮ সালের কোন এক সময় একান্ত আলাপচারিতায় তিনি এসব তথ্য জানান।

২. একবার প্রেসিডেন্ট জিয়া সরকারি সফরে সৌদি আরব যান। প্রেসিডেন্টের জন্য বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বেশ খানিকটা অব্যয়িত ছিল। এদিকে প্রেসিডেন্টের স্লিপিং স্যুট ছেঁড়া ছিল, যথেষ্ট গেঞ্জি এবং ভাল একজোড়া জুতা ও ছিল না। সামরিক সচিব এগুলো কিনে আনার জন্য অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করেন। প্রেসিডেন্ট এসব দেখে রেগে যান। সবগুলো জিনিস ফেরত দিতে হয়। অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রাও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৩. অন্য আর এক সময় প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজ দেশ বগুড়া সফর করছিলেন। প্রেসিডেন্টের বিদেশী দামী টুথপেষ্ট কিনে দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট তা ফেরত দিয়ে অতি সাধারণ তিব্বত টুথপেস্ট আনতে বলেন।

৪. একবার সকালের নাস্তায় তাঁকে প্রচুর আপেল খেতে দেয়া হয়। তিনি আপেল ফিরিয়ে দিয়ে কয়েকটি দেশী পেয়ারা আনিয়ে নেন। বঙ্গভবনেও অনেকবার এরকম পরিবর্তন করতে হয়।

৫. প্রেসিডেন্ট জিয়া বঙ্গভবনে থাকতেন না। একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর সেনানিবাসে অবস্থান সম্পর্কে উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিত করলে তিনি বেশ খোলামেলাই বলেন বঙ্গভবন তাঁর পরিবারের জন্য বেশ বড়; তাছাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তিনি এ জন্যই বঙ্গভবনে থাকেন না। নানাজনের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সেনানিবাসস্থ বাসভবনকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করতে অস্বীকার করেন।

৬. রমজান মাস। প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করছেন। অবশেষে সেহরীর সময় ঘনিয়ে এলো। বাসায় ফিরে যাবেন বলে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়নি। একজন বিরানী নিয়ে আসার প্রস্তাব করলেন। প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বঙ্গভবনের সাধারণ কর্মচারিদের জন্য রান্না করা খাবারই সপরিষদ খেলেন।

সাবেক উপদেষ্টা এবং সচিব কাজী ফজলুর রহমান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বছর পাঁচেক আগে এ ঘটনা বলেছিলেন।

ঝ। আমরা জিয়াকে বলি 'সৈনিক রাজনীতিবিদ' (Soldier turned politician)। তিনি রাজনীতিবিদ হয়েছিলেন। কিন্তু কখনো রাজনীতিবিদদের মতো সস্তা কথা এবং কৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা কর্মী-সাধারণকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেননি। হাল্কা রসিকতা করতেন। নিজ ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের মধ্যেই তা সীমিত থাকতো। তিনি ত্যাগী এবং জনসংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের পছন্দ করতেন। নেতা-কর্মীদের খাই খাই মনোভাবের খোলামেলা সমালোচনা করতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গভীর ধার্মিক ছিলেন। নামাজ ও রোজার ব্যাপারে সব সময়ই আন্তরিক ছিলেন। কোন কোন সময় আনুষ্ঠানিকতার মাঝেও নামাজ পড়তে ভুলতেন না। জনগণের গভীর ধর্ম-বিশ্বাসের কথা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। এতুদ্দেশে যে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনা হয় তা ছিল তাঁর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। এর মাঝে কোন কৃত্রিমতা বা মোনাফেকী ছিল না। কখনো কখনো নেতা কর্মীদের ধর্ম উপদেশও দিতেন।

www.pathagar.com

এক। একজন ব্যক্তি তাঁর মহৎ কর্ম ও আদর্শের দ্বারা মানুষের মাঝে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেন। এমন অবস্থায় ব্যক্তি আর নিজস্ব পরিসরে অবস্থান করে না। ব্যক্তি রাষ্ট্র বা জাতির সম্পদে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বেলায় তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যার জীবনে প্রথম ছিল বাংলাদেশ এবং শেষ ছিল বাংলাদেশ, জনগণের হৃদয়ে তাঁর জন্য একটি চিরস্থায়ী আসন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ব্যালটের রায়ে বারবার সেই-প্রতীতিই ব্যক্ত করেছে।

নেতা চিরস্থায়ী নয়, নীতি চিরস্থায়ী। শহীদ জিয়ার ব্যক্তি জীবন থেকে দেশ ও জনতার অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে। আমাদের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের যে হাল-চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শহীদ জিয়ার সৈনিকরা তাঁর আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের মহৎ আদর্শে নিজেদের উজ্জীবিত করবে। এটাই সময়ের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

৫

জিয়া হত্যাকাণ্ড ঃ একটি গভীরতর অনুসন্ধান

একটি দেশ ও জাতির প্রাণপুরুষ যখন প্রাক সীমানা পেরিয়ে গড়তে চায় আপন অন্য কোন ভুবন, তখন সীমানা পেরুনোর বিপদ হিসেবে উড়ে যেতে পারে তাঁর প্রাণপাখি। একজন সামরিক শাসক ব্যারাক অতিক্রম করে যখন অর্জন করে জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা তখন ব্যারাকের উচ্চাভিলাষীরা ঘুরিয়ে দিতে পারে তাদের বন্দুকের নল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাকরণ সে কথাই বলে। জিয়াউর রহমানের শাহাদত এর নির্মম স্বাক্ষর। জনগণের কল্যাণ সাধনে যখন এই দেশনায়ক নিরন্তর সংগ্রামরত, পাহাড় কেটে কেটে এই জননায়ক যখন এই জাতির ভাগ্য পথ নির্মাণ করতে ব্যস্ত তখন তাঁর সাবেক সভাসদরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মোহে বাতিকগ্রস্ত। দেশপ্রেম, শৃংখলা, ব্যক্তি নৈকট্য বা বন্ধুত্বের চেয়ে তখন ক্ষমতা এবং ক্ষমতার লালসাই একমাত্র নিয়ামক। তখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের আড়ালে উচ্চারিত হয় মহৎ শব্দাবলীঃ 'মুক্তিযুদ্ধ' 'মুক্তিযোদ্ধা', 'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি' ইত্যাদি। ৩০ মে'র মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্ভবত এ রকম একটি পটভূমি দেয়া যায়।

জিয়াউর রহমান ছিলেন এই জাতি তথা রাষ্ট্রকাঠামোর চতুর্থ প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত কার্যত তিনিই ছিলেন এই জাতির নেতা।

তৃতীয় বিশ্বে বিরল এবং নিপাতনে সিদ্ধ একটি প্রপঞ্চ তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন সামরিক শাসক যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে জনগণের নেতাঃ সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের (Charismatic leader) আসন পেতে পারেন জিয়াউর রহমান তা প্রমাণ করে গেছেন। জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রতি বেশ কয়েকবার জনগণের রায় প্রদান এবং এখনও সতত প্রবহমান সমর্থন তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশ এবং বিদেশে এর স্বীকৃতিও রয়েছে প্রচুর। রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাঁকে ফিদেল ক্যাস্ট্রো, জুলিয়াস নায়ারের, সুকর্ণ বা নাসেরের সাথে তুলনা করেছেন। গোটা বিশ্ব সংবাদপত্র তাঁকে 'কঠোর পরিশ্রমধর্মী' 'সততার

www.pathagar.com

প্রতীক' ও 'স্থায়িত্বের ধারক' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছে। একজন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বীকার করেন ঃ

"Despite the authoretarian character of Zia's Government, he was one of the Bangladesh successful leaders providing the country with stability. (Paladas Ghoshal, Bangladesh: passage to Military rule. Foreign Affairs reports, 8 August 1982, P. 149)

বিদেশে বিপুল সম্মানের অধিকারী বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Zillur Rahman Khan mPuj" 'In spite of many short commings leadership in Bangladesh projected a favourable image under Zia rising in the esteem of developed countries." (Martial law to Matial law : Leadership Crisis in Bangladesh. P.216)

জিয়াউর রহমান যখন '৭৯-এর সংসদীয় নির্বাচনের পরে খুবই সতর্কতার সাথে ধীরে সুস্থে নেমে আসেন জনতার কাতারে অথবা তিনি যখন নির্বাচন, সংগঠন ও জনসংযোগের মধ্য দিয়ে একটি গণভিত্তি অর্জন করেন, তখন সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা একটি গ্রুপ ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এই উচ্চাভিলাষী অংশ জিয়াউর রহমানের ভারসাম্য, স্থায়িত্ব, উৎপাদনের রাজনীতির সাথে নিজেদের যবনিকা লক্ষ করে। সেনাবাহিনীর ঐক্য, শৃংখলা ও নৈতিকতা বিরোধী এই অংশ স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ক্ষমতার শীর্ষ ব্যক্তিকে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে'র সেই শোকাবহ ঘটনা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজও হিমালয়ের মতো ভারী হয়ে আছে। সেই জানা ঘটনার ঘনঘটা আজকে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আমাদের আজকের এই নিবন্ধের লক্ষ্য ঘটনার তাৎপর্য এবং নায়কদের পরিচিতি নির্ণয়।

ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাপ্তি

জিয়াউর রহমানের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড কেন ঘটল আর কারাই বা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এ নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা সাদামাটা শুধু মাত্র রাজনৈতিক মোড়কে ঘটনাবলী ব্যাখ্যা না করে ঘটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। একটা যৌক্তিক তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন তাঁরা। যে সব তত্ত্ব দিয়ে জিয়া হত্যাকাণ্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো হলো।

(১) ব্যক্তিগত আক্রোশ তত্ত্ব (Personal Revenge theory)

(২) এক ঢিলে দুই পাখি তত্ত্ব (Two birds at one stone theory)

www.pathagar.com

(৩) রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Politico economic theory)

(৪) রোমান্টিক অভিযান তত্ত্ব (The theory of adventurism)

(৫) সেনাবাহিনীর স্বার্থ সংরক্ষণ তত্ত্ব (Theory of corporate interest of the army)

(৬) বিদেশী হস্তক্ষেপ তত্ত্ব (Foreign interference theory).

(৭) গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণ তত্ত্ব (Group interest theory)

শাহাদাতের ঘটনা

ঘটনাটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সুপরিকল্পিত। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর সব সচরাচর সফরের মতো ১৯৮১ সালের ৩০মে সকাল বেলা চট্টগ্রাম যান। সেখানে তিনি কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত করেন। বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ ঝগড়া মেটানোই ছিল এ সফরের মূল লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের একটি কক্ষে ঘুমোতে যান রাত-দুপুরের পর। কয়েক ঘন্টা পর সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার আকস্মিক এবং বলতে গেলে আলোর গতিতে সার্কিট হাউস আক্রমণ করে। স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যায় তাঁর বুক। তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বিদ্রোহীরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে। সেখানে তাঁরা 'বিপ্লবী পরিষদ' রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে এমন ঘোষণা দেয়। এই পরিষদের প্রধান হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের নাম ঘোষণা করা হয়। তথাকথিত এই বিপ্লবী পরিষদ ১১টি ঘোষণা প্রদান করে। এই পরিষদ শাসনতন্ত্র বাতিল করে .... সংসদ বিলুপ্ত করে, মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করে। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি বাতিল সহ আরও কিছু ঘোষণা তাঁরা দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ঢাকাস্থ সরকার এবং সেনাবাহিনী সাংবিধানিক সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। চট্টগ্রামের জনগণ সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মঞ্জুর এবং তাঁদের পরাজয় নির্ধারিত হয়। মঞ্জুর পুলিশের হাতে প্রথমে ধরা পড়েন এবং পরে সৈনিকদের হাতে নিহত হন।

১. ব্যক্তিগত আক্রোশ তত্ত্ব

মুক্তিযুদ্ধ ও ১৫আগস্ট '৭৫-এর পরবর্তী ঘটনাবলীতে মঞ্জুর ছিলেন জিয়ার সহযোদ্ধা ও সহচর। উচ্চাভিলাষী মঞ্জুরের ধারণা ছিল জিয়া প্রেসিডেন্ট হলে মঞ্জুর সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন সেনাপ্রধান হলেন মঞ্জুর জিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলেন। " It was also widely assumed that

www.pathagar.com

Manjoor was a bit too independent, arrogant, ambitias and revolutionary to warrut Zia's complete trust," (Marcus franda, Bangladesh: the First decade, 1982, P 313).

এই অবস্থায় মঞ্জুরকে খুশি করার জন্য জিয়া নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু মঞ্জুর কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি পাকিস্তান ফেরত এরশাদকে সেনাপ্রধান করার ঘটনাকে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী; কাজ রূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামে বদলি করার পর কারণে অকারণে নানা যুক্তিতে তিনি তার আশপাশে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সমাবেশ করতে থাকেন। সেনাপ্রধান সুবিধাবাদী এরশাদ জেনেশুনেও মঞ্জুরের শত্রুতা লাভের চেয়ে তার আজ্ঞাবহ থেকে উভয়কূলের আস্থাভাজন থাকার চেষ্টা করেন। যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর "He (Manjoor) began to fret and fume and become openly resentful to Zia" (Mascarenhas, Bangladesh: A Legacy of Blood. P-156).

মঞ্জুরের ঐ ক্ষোভ ও আক্রোশের প্রকাশ ঘটে ২০ মে '৮১ জেনারেলদের সাথে জিয়ার বৈঠকে। এ সময় মঞ্জুর জিয়ার প্রতি আপত্তিকর আচরণ করেন। 'মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ভূলুণ্ঠন,' 'বিএনপি দুর্নীতির আখড়া', 'অতি রাজনীতিক প্রবণতা' ইত্যাদি নানা কথা মঞ্জুর জিয়াকে বলেন। মঞ্জুরসহ আরও দু'একজন সামরিক আইন জারির কথাও বলেন। কিন্তু জিয়া সাংবিধানিক ধারা অনুসরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আরও সপ্তাহ খানেক পরে যখন কমান্ড্যান্ট হিসেবে বদলি করা হয় তখনও তিনি এটাকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং এই ঘটনাটিকে নিছক ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ ঘটনার পিছনের ঘটনাগুলো, ঘটনা পরম্পরা এবং তদন্ত প্রতিবেদনসমূহ ব্যাখ্যা করলেই সত্যিকার ঘটনা জানা যাবে। তবে হত্যার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ক্রোধ Acceletor হিসেবে কাজ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। (ক) যেহেতু মঞ্জুর এককভাবে দায়ী নয়, (খ) একটি গ্রুপ তার সাথে ছিল, (গ) দেশী-বিদেশী শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, তাই মঞ্জুরের ব্যক্তিগত আক্রোশ হিসেবে ঘটনা ব্যাখ্যা করা সত্যের অপলাপ হবে।

২. এক ঢিলে দুই পাখি তত্ত্ব

জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মঞ্জুরকেও প্রাণ হারাতে হয়। জিয়াউর রহমানের হত্যাকারী হিসেবে প্রমাণিত আরও যে সব সামরিক অফিসারে ফাঁসি হয় তাঁদের অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং একজন

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাকে আর একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এক ঢিলে দুই প্রধান মুক্তিযোদ্ধা এবং আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ রকম একটি ধারণা জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি। ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকা ঘাটলে একটি দল বা মতাদর্শভিত্তিক পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের তত্ত্ব এবং তথ্য চোখে পড়বে। এরশাদ স্বৈরাচারীর পতনের পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থের একজন লেখকও ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র ও কতিপয় বুদ্ধিজীবিও ধারণাটির প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত তার জনপ্রিয় বই In Blood and tears-এ এই ধারণা প্রকাশ করেন। আর একজন ভারতীয় সাংবাদিক মঞ্জুরকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে বর্ণনা করেন ("Manash ghosh, Manjoor was a victim, not the villain, "The statesman, 17 June. 1981)

জিয়া হত্যা পরবর্তী ক্ষমতা দখলের কারসাজির সাথে এ তত্ত্বের মিল রয়েছে। তবে নেপথ্য নায়কেরা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি কখনো।

৩. রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব

জিল্লুর রহমান খান বিদেশে নামী একজন বাংলাদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তিনি জিয়া হত্যাকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক বিষয়াবলীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় জিয়া নিহত হয়েছেন এজন্য যে-"He wanted to shift his power base from a military bureaucratic industrial combine to a mass oriented in stitutional frame" (Zillur Rahman khan. Martial law to martial law : Leadership crisis in Bangladesh, 1984. P-216)

এই ধারণার একটি অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতও আছে। বদরুদ্দিন উমর বুর্জোয়া অর্থনীতিক সংকটের মাঝে জিয়ার পতন লক্ষ করেছেন। (Badruddin omar, "General crisis of the Bourgeoise in Bangladesh" (Economic and Political weekly, 10 August 1985).

রেহমান সোবহান পরনির্ভরশীল অর্থনীতিতে বিপদ দেখেছেন।

(Rehman Sobhan, the crisis of External dependence, 1982 pp 26-58).

এ ধারণাটি অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক বলে সমলোচকরা মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া এ ধারণাটির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ ও উপাত্ত তাত্ত্বিকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

সাদামাটাভাবে বলা যায় জিয়াউর রহমান এমন পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেননি যা তাঁর পতন ঘটাতে পারে।

৪. রোমান্টিক অভিযান তত্ত্ব

জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো লেখক মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল ও সেনাবাহিনীর সামগ্রিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য গেরিলা ধরনের প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। একটি প্রথাগত সেনাবাহিনী যখন একটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই তার অভ্যন্তরীণ শৃংখলা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেনাবাহিনী রাজনীতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। বার্মা (আজকের মায়ানমার) ও ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর অব্যাহত হস্তক্ষেপ প্রবণতার পিছনে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" সব সময়ই ক্রিয়াশীল। বাংলাদেশে '৭৫ এবং '৮১-এর হত্যাকাণ্ডকে অনেকে ঐ ব্যাখ্যা দ্বারাও ব্যাখ্যা করতে চান। মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলা স্টাইলে যে 'Hit and run' রণকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। একটা এ্যাডভেঞ্চারইজম দ্বারা এসব সৈনিক-অফিসাররা তাড়িত হয়েছে। এর ফলাফলটা ততটা ভেবে দেখেননি তারা। ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান এ ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। (Talukder Maniruzjaman, Group interests and Political changes: studies of Pakistan and Bangladesh, 1982,P.252)। কোনো কোনো বিদেশী পত্রিকা অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছে।

তত্ত্বগত দিক দিয়ে বিশ্লেষণটি সঠিক, তবে দেখা যায় এ তত্ত্বটি ঘটনার প্রায়োগিক দিক বা রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করেই শেষ হয়েছে। এ তত্ত্ব ঘটনাটির অন্যান্য দিক দিয়ে মোটেই আলোকপাত করেনি। সুতরাং বড়জোর আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণকে আংশিক বলে স্বীকার করে নিতে পারি।

৫. সেনাবাহিনীর স্বার্থ সংরক্ষণ তত্ত্ব

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর স্বার্থ সংরক্ষণ তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। '৭৫-এর মধ্য আগস্টের হস্তক্ষেপের পর থেকে সেনাবাহিনীই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। জিয়াউর রহমান অনুসৃত বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া যতই এগুতে থাকে সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ততই কমতে থাকে। যদিও সেনাবাহিনীর স্বার্থ সংরক্ষণে জিয়া সম্ভাব্য সবকিছু করেছেন তারপরও জিয়াউর রহমান অতিমাত্রায় রাজনীতিপ্রবণ হয়ে উঠুন এটা

www.pathagar.com

যেন সেনাবাহিনীর লোকেরা মেনে নিতে পারছিল না। আর যারা মেনে নিতে পারছিল না তারা তার বিরোধিতা করছিল জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে। প্রফেসর এমাজউদ্দীন তাঁর প্রকাশিত "Military Rule and the Myth of Democracy' গ্রন্থে এই ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "The corporate interest of the military elite rewained entwined with the circumstances over which the cavaliers nature of General Zia most of had very little control." তবে জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এই স্বার্থ সংরক্ষণের ধারণায় প্রয়োগ যৌক্তিক নয়। কারণ ঃ

ক. এই হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়া বা ঘটনা পরস্পর সামগ্রিক সেনাবাহিনীর কোনো অংশগ্রহণ-সমর্থন ছিল না। অধিকন্তু, ঐ সব হত্যাকারী সাধারণ সৈনিকদের সম্পর্কে ভয়-ভীতির মধ্যে অবস্থান করেছিল।

খ. হত্যা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের পক্ষ থেকে ঐ সব হত্যাকারী সমর্থন তো পায়নি, বরং এদের হাতেই হত্যাকারীদের পতন ঘটে।

গ. জেনারেল মঞ্জুর যে কয়টি বিধি নিষেধ জারি করেছিলেন তাতেও পুরো সেনাবাহিনীর কোনো বিশেষ স্বার্থ তুলে ধরা হয়নি। বরং সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ অংশের স্বার্থই সেখানে ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে পরবর্তী সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থাৎ এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ ক্ষেত্রে এই ধারণাটি সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

৬. বিদেশী হস্তক্ষেপ তত্ত্ব

তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে বিদেশী হস্তক্ষেপ নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে যাই ঘটুক না কেন এতে বিদেশী হস্তক্ষেপ রয়েছে এরকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে। জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটিও তার ব্যতিক্রম নয়। দেশী-বিদেশী নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা এ ব্যাপারে নানা ধরনের খবর প্রকাশ করে।

সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাস জানায়, এই হত্যাকাণ্ডে বেইজিং তথা তার এতদ্দেশীয় এজেন্টদের হাত রয়েছে। তাসের খবরে বলা হয়, বেইজিং ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল ও বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার সমন্বয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে দক্ষিণাভিমুখী সাগর পানে তার সহজ যাতায়াত পথ চায়। এ খবরে বলা হয়, বেইজিংপন্থী একটি গেরিলা গ্রুপ ঐ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

এদিকে বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী পত্রিকা মুক্তিবাহিনীতে খবর বেরোয় যে, হত্যাকাণ্ডের আগে ঐ গেরিলা গ্রুপের তৎপরতার যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছিল।

কয়েক দিন পরে বেইজিং এই খবরের তীব্র প্রতিবাদ করে একে 'ডাহা মিথ্যা' বলে বর্ণনা করে। ভারতীয় পত্রিকা 'Stateman' খবর ছাপায় জিয়া হত্যাকাণ্ডে CIA-এর হাত রয়েছে। জিয়া একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে বলে CIA তাকে হত্যা করে বলে ঐ খবরে বলা হয়। CPB-এর পত্রিকা 'নতুন বাংলা' জিয়া হত্যাকাণ্ডকে 'জামাত-মাওবাদী' চক্রান্ত বলে বর্ণনা করে। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ভারতীয় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করে।

এ ব্যাপারে ভারতের SUNDAY-এ পরবর্তীকালে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ মুজিব হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) মিসেস গান্ধীর অনুমোদনক্রমে জিয়া হত্যার পরিকল্পনা করে। ইতোমধ্যে মিসেস গান্ধীর পতন হলে ব্যাপারটি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। শ্রী দেশাই এতে অত্যন্ত বিচলিত হন এবং আর অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ দেন। 'র'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয় ফেরার আর পথ নেই। ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। মোরারজী দেশাই-এর সময়কালে আর অঘটন ঘটতে পারেনি। মিসেস গান্ধী পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জিয়াউর রহমান নিহত হন। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীনভাবে এই হত্যাকাণ্ডে তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে।

৭. গোষ্ঠী স্বার্থ তত্ত্ব

দেখা গেল উল্লেখিত তত্ত্ব ও তথ্য জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে প্রকৃত অর্থে কারা দায়ী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য? দেশ ও বিদেশের পন্ডিত ও রাজনৈতিক সমীক্ষকগণ এক্ষেত্রে ঘটনা প্রবাহ ব্যাখ্যার জন্য Group interest theory বা গোষ্ঠী স্বার্থ তত্ত্বের ভিত্তিতে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চান। এই গোষ্ঠী স্বার্থ তত্ত্বকে এই সব গবেষকরা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে চান-

ক. অভ্যন্তরীণ খ. সামরিক গ. বিদেশী। গোষ্ঠী স্বার্থ তত্ত্বের ব্যাখ্যাকারীরা মনে করেন একটি গোষ্ঠী বা অংশের স্বার্থকে সমন্বিত করার জন্য দেশী বা বিদেশী কোনো শক্তি বিশেষ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছে। এর পিছনে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা হয়েছে। আর সুফল লাভের জন্য অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

অস্থিরতা, সামরিক ক্ষেত্রে জিঘাংসা এবং বিদেশে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

গোষ্ঠী স্বার্থের গোড়ার কথা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজন রেখা জনসাধারণের মধ্যে "দালাল-মুক্তিযোদ্ধা' সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে "মুজিব নগরীর অমুজিব নগরীর" এবং সেনাবাহিনীতে "মুক্তিযোদ্ধা-পাকিস্তান প্রত্যাগত" এই সব নামে পরিচিতি অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরা পদোন্নতি, পজিশন এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুবিধা দাবি করে। রাষ্ট্রক্ষমতায়ও তারা তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব দাবি করে। দিনে দিনে এরা একটি স্বতন্ত্র Interest group-এ পরিণত হয়। রাজনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক বিশ্লেষণে যথার্থই তারা একটি গোষ্ঠী হিসেবে দায়ী করার বৈধতা অর্জন করে। এই গোষ্ঠীবাদের ঠাণ্ডা লড়াই তীব্রতর হয় সেনাবাহিনীতে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে আটক বাঙালী সৈনিকরা যখন স্বদেশে ফিরে আসে, তারা নিজেদেরকে এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলিত এবং অসহায় দেখতে পায়। (Craig Baster, An Apprcisal of a Decade of political Development" The world to day, February 1982) মুক্তিযোদ্ধাদের দু'বছরের সিনিয়রটি দেয়ায় অনেক পাকিস্তান ফেরত তাঁদের জুনিয়রদের অধীন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা অধিক থেকে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। প্রত্যাগতদের বেতনভাতার ব্যাপারটি মীমাংসিত হতে অনেক সময় লেগে যায়। এভাবে একটি "ঠাণ্ডাযুদ্ধ" প্রসার লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর পাকিস্তান প্রত্যাগতরা মনস্তাত্ত্বিক ও সংখ্যাগত কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায়। এ ছাড়া '৭৫ থেকে '৮১ সাল অবধি সময়ে অনুষ্ঠিত বিপ্লব, পাল্টা বিপ্লব দুর্ঘটনা ও বাধ্যতামূলক ছুটি ইত্যাদি কারণে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম আসে। এ সময় 'বিপ্লবী' 'অতিমাত্রায় রাজনীতি প্রবণ" এবং 'উচ্চাভিলাষী' মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে 'বিশ্বস্ত' 'প্রফেশনাল' এবং 'অপেক্ষাকৃত কম রাজনীতিপ্রবণ' 'পাকিস্তান ফেরত' অংশের প্রতি জিয়াউর রহমানের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের একাংশ পাকিস্তান প্রত্যাগতদের নতুন অবস্থানকে তাদের প্রতি অবজ্ঞা বলে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে গোটা সেনাবাহিনীতে ১৫% মুক্তিযোদ্ধা, ২৫% পাকিস্তান প্রত্যাগত এবং অবশিষ্ট ৬০% নতুন মুখ থাকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ নানাভাবে সরকারকে বিব্রত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ অবধি জিয়া বিরোধী অসংখ্য 'ক্যু-এর স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা হচ্ছে এক শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা নেতৃত্ব। জিয়ার নতুন নীতি অবস্থাও এই মুক্তিযোদ্ধারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনেও জিয়াউর রহমান এমন সব কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে খুশী করলেও "ঘরে-বাইরে" মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশকে হতাশ করে। শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ ও ইসলামী ধারাসমূহ সংযোজন, বাজার অর্থনীতি, ইসলামী ভাবধারার পুনরুত্থান ও Consensus Builder হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সেভাবে সেনাবাহিনীর উভয় গ্রুপকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। জিয়াউর রহমান মেজর জেনারেল মঞ্জুর এর রাজনৈতিক ধারণায় 'নব্য রাজাকার" রূপে অভিহিত হন। অপরদিকে, 'উচ্চাভিলাষী' 'ক্ষমতালোভী' 'অতিমাত্রায় রাজনীতিপ্রবণ' সেনা অফিসাররা মঞ্জুরের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আর একটা বিপ্লব করার পাঁয়তারা করতে থাকে। 'একটি পরিবর্তন অনিবার্য' জাতীর স্বার্থেই 'জিয়ার অপসারণ প্রয়োজন' এবং 'মুক্তি অত্যাসন্ন' ইত্যাদি মন্তব্য তারা প্রকাশ্যেই ছুঁড়ে দেয়। গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, জিয়া সরকার সেনাবাহিনীর সকল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(Mascarenhas, A legacy of Blood, P-157)

শুধুমাত্র অপসারণ নয় মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হত্যার গুজবও ছড়িয়ে দেয়া হয়। 'অনেকেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, চট্টগ্রাম ৩০৪ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হিসেবে কর্মরত মেজর কাইউম এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি সেনাবাহিনীর সদর দফতরে এডজুটেন্ট জেনারেল ব্রাঞ্চে মেজর তাহেরকে আসন্ন বিপদের কথা বলে তাঁকে কিছু দিনের জন্য ছুটিতে যেতে পরামর্শ দেন। (মেজর রফিকুল ইসলাম, একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়, ১৯৯২ পৃঃ-৫)।

জেনারেল মঞ্জুর ঐ গুজবের বাস্তবতা হিসেবে এবার ঢাকা সেনাবাহিনী স্টাফ কলেজে তাঁর বদলির ব্যাপারটি তুলে ধরেন। তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের এটা বোঝাতে সক্ষম হন যে, ক্রান্তিকাল দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করার এখনই সময়। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই যেহেতু সেনা কমান্ডে আছেন তিনি যদি কিছু না করেন মুক্তিযোদ্ধাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আর ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররাও "Were fedup with malicious his

www.pathagar.com

against the repatriates and president Zia. (Emajuddin Ahamed, Military Rule and the Myth of Democracy. P-122) জেনারেল মঞ্জুরের দুই প্রধান সহযোগী ছিল লেঃ কর্নেল মতিউর ও লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান। তারা উভয়ই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা তাদের ষড়যন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য কেবলমাত্র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরই বাছাই করেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল 'A collective effort by like minded officers is required to solve the problems once for all.' (Mascarenhas, P-157) তাঁদের চিন্তায় চেষ্টায় এবং বাস্তব কাজে একটি গ্রুপ ইমেজ এবং গ্রুপ ইন্টারেস্ট স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। তাঁদের গ্রুপ ইন্টারেস্টের আরও দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে ঃ

১. তারা পাকিস্তান প্রত্যাগত এরশাদকে ডিমোশন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মীর শওকত আলীকে সেনা প্রধান নিয়োগ করে তাঁকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে।

খ. চট্টগ্রামে ঘটনার পরদিনই তারা বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করে।

গ. এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন সেনানিবাসে মঞ্জুর ও তাঁর সহযোগীরা শুধু মাত্র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাথেই আলাপ করেছেন অন্য কারো সাথে নয়।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

জিয়া হত্যাকারীদের স্বরূপ অন্বেষার জন্য আমাদের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে ফিরে তাকাতে হয়। জিয়াকে তখনই হত্যা করা হয় যখন অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানের পর দেশ সুস্থির স্থিতিশীলতা ও শান্তি অর্জন করতে যাচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও জিয়াউর রহমানকে রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ করার প্রবণতাসমূহও ক্রিয়াশীল ছিল। এ সময় এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যবর্তন ঃ ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টের ঘটনাবলীর পর 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা স্ব-ইচ্ছায় ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। জিয়া হত্যার মাত্র কয়েক দিন আগে অর্থাৎ ১৭ মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রত্যাবর্তন জিয়া বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে শক্তিশালী করে।

২. মুক্তিযোদ্ধা- অমুক্তিযোদ্ধা বিরোধ ঃ ১৯৮০ সালের শেষ দিকে জামায়াত বিশেষত ইসলামী ছাত্রশিবির যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে পরিচয়দানকারী রাজনৈতিক দলসমূহ ইসলামপন্থীদের এ উত্থানকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। জিয়া হত্যাকাণ্ডের অন্তত ৫ মাস আগে থেকে বিভিন্ন জেলা শহরে মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা বিরোধ ও সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে মধ্যপন্থী নীতিভঙ্গি অনুসরণ করায় এবং Consensus builder হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করায় ওই সব সংঘর্ষ তাঁর জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। মাসকারেনহাস এই সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সাথেও শেখ হাসিনার আগমনকে সম্পৃক্ত করেছেন। (A Legacy of Blood, P-135) এই সাংঘর্ষিক অবস্থার কারণে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি ঘটে। ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান মনে করেন দেশের ওই অবনতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে মঞ্জুর সম্ভবত ভুল মূল্যায়ন করে থাকবেন। উল্লেখ্য যে, মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে জেনারেল মঞ্জুর ঢাকা এসেছিলেন। দ্রব্য মূল্য, আইন শৃংখলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকেই তখন জিয়ার সমালোচনা করেছিলেন। এ থেকে সম্ভবত মঞ্জুর ধরে নিয়েছিলেন মুজিব হত্যার মতো জিয়া হত্যাকেও জনগণ স্বাগত জানাবে। মঞ্জুর হয়তো মনে করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করবে। (Group Interest and Political Change, P-250) এ সময় দায়িত্বশীল দৈনিক New Nation পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে (৩০ এপ্রিল '৮১)। দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী সমূহও (DGFI,NSI ইত্যাদি) এ সময় সতর্ক সংকেত দেয়। কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষের মমত্বের প্রতি আস্থা রেখে জিয়া অগ্রসর হন। তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তিনি নির্মমভাবে নিহত হন, তাঁর এক সময়ের স্বজন ও সহচরদের হাতে।

www.pathagar.com

উপসংহার

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব নিরূপণের জন্য তিন তিনটি কমিশন গঠিত হয়। কোনো কোনো কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পরও অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ওই সময়ে একটি সংক্ষিপ্ত শ্বেতপত্র (White paper) প্রকাশিত হয়।

কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হলে মানুষ সত্য কথা জানতে পারতো। ঘটনার উৎসমূল চিহ্নিত হওয়া রাজনৈতিক বিবেচনায়ই অনিবার্য ছিল। কারা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রত্যাবর্তন জিয়া অথবা কারা এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য মদদদাতা জাতির স্বার্থেই তাঁদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন ছিল। ক্ষমতার হাত বদলের সাথে সাথে খুনিদের সপক্ষে যে চাতুর্যপূর্ণ প্রচারণা চলছে, সত্যকে হাজারো মিথ্যে দিয়ে ঢেকে দেয়ার যে ঘৃণ্য অপচেষ্টা চলছে, তাই প্রমাণ করে কোন্ গোষ্ঠী স্বার্থে কারা তাকে হত্যা করেছিল। জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত শাস্তিপ্রাপ্তদের সপক্ষে প্রচারণা চালিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং জিয়াউর রহমানকে হত্যাকারী প্রমাণ করার কূটকৌশল অব্যাহত রয়েছে। যে সব হত্যাকারী শাস্তিভোগ করছে অথবা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বা বিদেশে অবস্থান করছে তাঁদের উল্টো 'হিরো' বানানোর জঘন্য তৎরতা চলছে। ইতোপূর্বে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী সরকার হয়তো জাতীয় সংহতির স্বার্থে প্রতিশোধ স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে ওই খুনীদের অপতৎপরতা জাতির জন্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

www.pathagar.com

৬

জিয়াউর রহমান
নেতৃত্ব কর্মকৌশল ও জাতীয় স্বার্থ

১. পরিবর্তনশীল বিশ্বের রাজনীতি অধ্যয়নের দিকপাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এস. পি. হান্টিংটন দুটো প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরন ধারণ বা গতি প্রকৃতি ব্যাখা বিশ্লেষণের পরামর্শ দিয়েছেন।[১] এ দুটো প্রেক্ষিতের প্রথমটি ব্যক্তিগত। দ্বিতীয়টি সামষ্টিক। প্রথমটিকে মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতেও বলা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক মানদন্ড ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার এবং বিশ্বাসকে ধারণ করে। আর সামষ্টিক মানদন্ড সংগঠন ও সমষ্টির সমন্বয়ে প্রস্ফুটিত জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটায়। সামষ্টিক ব্যাপারটি ব্যাপক। নেতা বিষয়টিকে কিভাবে গ্রহণ করেন এবং কিভাবে আরোপিত দায়িত্ব সম্পাদন করেন নেতৃত্বের বিচারে তা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সফলতা ব্যর্থতা আবার দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রথা প্রতিষ্ঠান গড়ার সফলতা। এসব দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপস্থাপিত নিবন্ধে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব, কর্মধারা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে অবদানের ব্যাখা বিশ্লেষণ প্রয়াস বিধৃত।

২. জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণতঃ দুটো উপায়ে গণমানসকে পরিচালিত করেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ও নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রথমতঃ গণজাগরণ দ্বিতীয়তঃ গণ উন্নয়ন। জাতীয় মুক্তির ধারণা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার অর্জন এবং কোন বিশেষ অর্জনের জন্য গণজাগরণ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অপরদিকে, জাতীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য গণঅংশগ্রহণের কর্মসূচি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতিকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। জিয়াউর রহমান এই বাংলাদেশ জাতির মুক্তি এবং উন্নয়নের জন্য একই সাথে উভয় রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাঁর রাষ্ট্রযন্ত্র এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে 'মুক্তি' এবং 'উন্নয়ন' এর

www.pathagar.com

জোয়ার সৃষ্টির চেষ্টা করেন। একজন বাংলাদেশী গবেষক স্বীকার করেন যে, "His (Ziaur Rahman's) leadership auany the ruril unasses for participation in local developmental activities on a collective self help basis."[2]

৩. একজন সম্মোহনী নেতা স্বভাবতই আবেগ আপ্লুত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও নিজস্ব আবেদনে আপন ভুবনে সমুজ্জল। জিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জিয়া আমাদের এই পিতৃভূমির আর সব নেতাদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনিই বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর ইতিহাসে একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি শত শত মাইল পথ পায়ে হেটে যেতেন। তাঁর আবেদন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। গ্রামবাংলার হাজার হাজার মানুষের অনুভব অনুভূতিকে জেনে তিনি তাঁর রাজনীতির ভেলা সাজিয়েছেন-উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। রাজনীতিকে গ্রামের গহীন গভীরে নিয়ে যাওয়ার নিজস্ব ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এগুচ্ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছিল। আর এই সেতুবন্ধ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল। তাঁর আবেদনের এই অভিনবত্ব রাজনৈতিক অঙ্গন এবং তাঁর নিজস্ব দলকে প্রভাবিত করেছিল এবং জনপ্রিয় করে তুলেছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরণ ধারন স্বভাব প্রকৃতি আসলেই আমাদের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ ছিল। একবার জিয়াউর রহমান বলেছিলেন: "I will make politics difficult."[3] এর দ্বারা জিয়াউর রহমান শাব্দিক অর্থেই রাজনীতি কঠিন বা বিধিনিষেধ যুক্ত করতে চাননি। তাঁর এ কথার অর্থ ছিল -'Back to the village' -বাংলাদেশের গণমানুষের পিঠস্থান গ্রামে ফিরে যেতে রাজনীতিবিদদের বাধ্য করা। রাজধানী কেন্দ্রিক 'প্রাসাদ রাজনীতির' বেড়াজাল থেকে তিনি জনগণকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

৪. প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতির বিশেষ তাৎপর্য ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে-

ক. স্বনির্ভরতা আন্দোলন

খ. খাদ্য শস্য উৎপাদন দ্বিগুণকরণ প্রচেষ্টা

গ. খাল খনন কর্মসূচি

ঘ. গণশিক্ষা কর্মসূচি

ঙ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অভিযান

www.pathagar.com

চ. গ্রাম সরকার গঠন

ছ. যুব কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা

জ. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ঝ. গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভি ডি পি) ইত্যাদি উন্নয়ন ও জাতিগঠন কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে উন্নয়নের নতুন গতি সঞ্চার। একজন প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে, জনসভায় কি পথসভায় তাঁর প্রশাসন, রাজনীতি ও প্রতিপক্ষের জবাবী বক্তব্যের পরিবর্তে বেশি করে ধান ফলতে বলতেন, খাল খনন করতে বলতেন এবং গাছ লাগাতে বলতেন। এটি সত্যিই বিরল আবেদন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া' এর শেষ অংশ দেখুন) জিয়ার শাসন কালের প্রতিটি দিন প্রতিটি সময় কেটেছে ঐ উন্নয়নমূলক কাজে। বিশেষত শুকনো কাল খাল খনন কর্মসূচিতেই কেটেছে। দেখা যেত প্রেসিডেন্ট নিজেই কোদাল নিয়ে মাটি কাটতে এগিয়ে গেছেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে অনুসরণ করছে। সাধারণ মানুষ এ সব খালের মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে পানি এনে পানি শূন্য জমিতে চাষাবাদ করেছে। তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক কর্মদিবস কেটেছে খালখনন এর মতো জনপ্রিয় কার্যক্রমে। রাজধানীর বাইরে জিয়া কাটিয়েছেন অসংখ্য দিন অসংখ্য রাত। তিনি বিভাগীয় সদর এমন কি জেলা সদরেও ক্যাবিনেট মিটিং করেছেন।

স্থানীয়ভাবে সরেজমিনে সমস্যাটি অনুধাবনের জন্য এবং সমাধানে তা ৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবিধার্থে তিনি এসব মিটিং করতেন। মার্কিন সাংবাদিক মার্কাস ফ্রান্ডাকে একজন বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ বলে মূল্যায়ন করা হয়। তিনি সাক্ষ্য দেন; "I saw him leaving the capital by helicopter after an early breakfast and returning just before dusk."[৪]

৪. জিয়া বাংলাদেশের যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অজ পাড়াগাঁয়ে যেতেন, গ্রামের লোকজন এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের থেকে স্থানীয় এবং জাতীয় বিষয়ে তাদের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তিনি কেবলই শুনতেন। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন। লোকজন নিয়ে হাটতেন মাইলের পর মাইল। তার ভ্রমণসঙ্গীরা বিশেষত আমলারা পেরে উঠতেন না। তবুও তার পথ চলা থেমে থাকত না। আর একজন মার্কিন লেখক তার এই পথ চলাকে মাও সে তুঙ এর লং মার্চ এর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি আরও মন্তব্য

www.pathagar.com

করেন যে গ্রাম বাংলার পথে ঘাটে হাটে মাঠে তিনি এতটা হেঁটেছেন যে সম্ভবত এই জাতির আর দু'জন প্রাণপুরুষ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এতটা দেখেননি।[৫]

৫. পথ চলতে চলতে তিনি হঠাৎ করেই কোন কুঁড়েঘরের বারান্দায় অথবা কৃষকের দহলিজে পা রাখতেন। উদ্দেশ্য নিজের চোখে তাঁদের অবস্থা দেখা এবং তাঁদের আরও ফসল, আরও গাছ গাছালী লাগাবার জন্য উৎসাহিত করা। তিনি বলতেন ঃ

"আমরা গ্রামের মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারি না। আমরা তাঁদের নিরক্ষর রাখতে পারি না। এইসব লোকদের এভাবে রেখে শহুরে লোকজন ভাল থাকতে পারে না। সুতরাং তৃণমূল পর্যায় থেকে আমরা সমাজকে গঠন করতে শুরু করেছি।[৬]

এইসব ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ ঃ

১. দীর্ঘমেয়াদী গ্রাম উন্নয়ন।

২. সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে প্রথা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

৩. তাঁর ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্তকরণ।

খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল্লুর রহমান খান মন্তব্য করেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বসূরী আইউব খানের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। জনাব খান তৃতীয় বিশ্বের সম্মোহনী প্রবাদ পুরুষ ফিডেল ক্যাস্ট্রো, জুলিয়াস নায়ারে, সুকর্ণ এবং বাংলাদেশের নিকট অতীতের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেশগড়ার প্রয়াসের সাথে জিয়াউর রহমানের তুলনামূলক আলোচনা করেন।[৭]

৭. জিয়াউর রহমান নবগঠিত, রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'এলিট মাস গ্যাপ' সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাঁর নিজ হাতে লেখা শর্ট নোট এবং রাজনৈতিক প্রশিক্ষণমূলক বক্তৃতাসমূহ প্রমাণ করে যে, বিএনপি তে খুব সাধারণ মানুষের যে জায়গা হয়নি তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।[৮]

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য তিনি নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। তিনি এই অভিযানকে অভিহিত করেছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লব বলে। জনসংখ্যা নিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কেও ছিল তাঁর একই ধরনের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা। তিনি

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন সংগ্রহেরও চেষ্টা করেছেন। জনসভায় তিনি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে জনগণকে দু'হাত তুলে সমর্থন জ্ঞাপনের আহবান জানাতেন।

তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। জনগণের জন্য ছিল তাঁর বিরল ভালবাসা। জনগণও তাঁকে বিরল ভালবাসা দিয়েছিল। এটা একটা অবাক করার ব্যাপার যে, একজন কেতাদুরস্ত সৈনিক নেতা উর্দি ছেড়ে অল্পসময়েই জনগণের ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ১৯৭৫ পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আবহাওয়া মেরুকরণ, বাধ্যবাধকতা তাঁকে এমন কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল যা দেখে মনে হতে পারে তিনি দক্ষিণপন্থী। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন বামপন্থী। অবশ্য মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী নয়। গরীব নিতান্ত অসহায় মানুষের জন্য তাঁর মমত্ব ছিল। কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য তাঁর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেই এর প্রমাণ মিলবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে রুশ ভারত বিরোধী বামপন্থী মহলের প্রতি তিনি নৈতিক নৈকট্য অনুভব করতেন। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের প্রতি যতটা তাঁর রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছিল, নৈতিক কমিটমেন্ট হয়তো অতটা ছিল না। তাঁর ক্যাবিনেট গঠন এবং তাঁর আশে পাশে বুদ্ধিজীবিদের সমাবেশ বিচারেও একথা বলা যায়। তিনি তাঁর দলীয় গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, বেতার বক্তৃতা, এবং জনসভায় প্রচুর বামঘেঁষা শব্দাবলী 'বিপ্লব' 'শ্রমিকরাজ কৃষকরাজ' 'শোষিতের মুক্তি' ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

৬. দেশের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশে জিয়াউর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত সততার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় শহর ঢাকায় তাঁর এক ইঞ্চি জমিও ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল স্বচ্ছ স্বাভাবিক ও সুন্দর। তিনি স্বজনপ্রীতিকে প্রশ্রয় দেন নাই। নিজ পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের তদবির এবং তোষণ থেকে দূরে ছিলেন। মার্কাস ফ্রান্ডা' এর মন্তব্য :

"One of the reasows that Ziaur Rahman can speak so blithely. about corruption in his personal reputation for scrupulous hounesty where his own family is conurncd, Indeed, there has not been the slightest hint of the kind of farnilial corruption that sarrounted Mugibur Rahman when he was alive, or of charges that have tainted most leading politicians in Bangladesh.[9]

www.pathagar.com

৭. জিয়াউর রহমান তাঁর সৈনিক উত্তরাধিকারের কারণে কর্তৃত্ববাদী প্রবণ ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল সংগঠনের পরে তিনি সম্মতিপ্রবণ হওয়ার প্রয়াসী ছিলেন। তিনি দ্রুততর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। অতি আমলাতান্ত্রিক লালফিতা বা দীর্ঘসূত্রতায় ত্যক্ত বিরক্ত হতেন। প্রয়োজনে তিনি এককভাবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতেন। তবে এসব সিদ্ধান্ত যদি হতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অথবা দলের পক্ষ থেকে 'মৌলিক কোন সিদ্ধান্ত তিনি পরবর্তীকালে এটি যথাযথ পর্যায়ে অনুমোদন করিয়ে নিতেন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতেন। তিনিই ছিলেন ক্ষমতার মধ্যমনি। কেউ কখনো তাকে প্রশ্ন করতো না। কিন্তু তিনি নিজেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ছিলেন। সময় সুযোগ থাকলে কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত, সহযোগীদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। যখন কোন বিশেষ বিষয়ে বা চেনে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রয়োজন ছিল তিনি সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে, ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ না করে সিদ্ধান্ত নিতেন না। কোন জাতিগত বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিষয় বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠকের পর বৈঠক দিয়ে তিনি মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একই বিষয়ে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই বিষয় বিশেষজ্ঞদের তালিকায় ছিল শীর্ষ আমলা, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবি সফল ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশার শীর্ষ এবং প্রধান ব্যক্তিত্ববৃন্দ। এভাবে গোটা শাসনকালে তিনি সতর্ক ধীরস্থির নীতিভঙ্গির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তবে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সবকিছু করতে চাইতেন। শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান জিয়ার সরকারি যে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে রাজনৈতিক সহযোগীদের সাথে আলাপ আলোচনার দৃষ্টি ভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে তুরস্কের রিপাবলিকান পিপলস পার্টির সাথে কামাল আতাতুর্কের বিশ্বস্ত সম্পর্কের সাথে বি এন পি এর সাথে জিয়াউর রহমানের নির্ভরতার তুলনা করেন।[১০] তিনি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাপক সাক্ষাৎকার দিতেন এবং দেশ জাতি এবং দল সম্পর্কে তাঁদেরও মতামতের মূল্যায়ন করতেন। জিয়াউর রহমান এতদ্দেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের মতো সব ব্যাপারেই 'হ্যাঁ' বলতেন না। তিনি 'না' বলতে জানতেন। দলীয় নেতা কর্মীদের 'খাই খাই' মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করতেন। অন্যসব রাজনৈতিক নেতাদের মতো

www.pathagar.com

'পিঠ চাপড়ানো' বা শুধু কথায় তুষ্ট করার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে তিনি নেতা কর্মীদের আব্দার রক্ষা করতেন না এমনও নয়। তিনি অনুরোধে ঢেঁকি গিলতেন খুব দায়ে ঠেকে এবং তা এমনভাবে করতেন যেন তা দৃষ্টিকটু বা বেআইনী না হয়। রাজনৈতিক বর্ষপরিক্রমায় তাঁর মধ্যে সম্ভবত এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, এতদ্দেশীয় রাজনীতিতে দুর্নীতির আশ্রয় প্রশ্রয় না দিলে রাজনীতিতে টিকে থাকা দায়। পরবর্তীকালে এ ধারণার বশে তিনি নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত সততা সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে দুর্নীতিকে অন্তত সহ্য করেন বলে কোন কোন মহলের অভিযোগ রয়েছে।

জিল্লুর রহমান খান লিখেছেন; ".....A political Coupuls of maintain stability coupelled him to tollerate questionable practices by soure of his followers."[11]

একথার সমর্থন মেলে 'হলি ডে' সম্পাদক এ, জেড, এম, এনায়েত উল্লাহ খানের একটি মন্তব্যে। তাঁর মতে "Zia on the other hand like a skilful surgeon with gloves on, kept his own hands and there of his uinidiate kin clinically clean."[12]

জাতীয় স্বার্থ

৮. ক. বাংলাদেশ জাতি ও রাষ্ট্র এর একটি দুঃসময়ে জিয়াউর রহমান দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি দক্ষতা ও কুশলতার প্রমাণ রাখেন। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার দুটো ক্ষেত্রঃ সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল। একটি হস্তক্ষেপ প্রবণ সেনাবাহিনীতে শৃঙখলা ফিরিয়ে আনা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে শান্তি বজায় রাখার চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেশের শাসন ক্ষমতার অদল বদলের সমীকরণ জিয়াউর রহমানের অনুকূলেই সংগঠিত হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা তাদের অনুকূল রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা জনগণের এ ধরনের আতঙ্ক এবং আশঙ্কা জিয়াউর রহমানকে নেতিবাচক সুবিধা দান কর। 'সিভিল সোসাইটি' যারা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণের নীতিগত বিরোধী তারা আরও বড় ভীতির তুলনায় ছোটভীতিকে স্বাগত জানায়। জিয়াউর রহমান পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে প্রবাহিত করতে সক্ষম হন। তিনি সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা তথা 'প্রফেশনালইজম' ফিরিয়ে আনেন। জাতিকে কতিপয় 'ইস্যু'র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। যদিও এই জাতীয় ঐক্য পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

অব্যাহত ছিল না, তবুও তিনি তাঁর সময়কে ব্যবহার করে ক্ষমতা সুংসংহত করতে সক্ষম হন। এটাকে একাডেমিকভাবে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে কিছুটা চড়াই উৎরাই এর মাধ্যমে জাতি লাভ করে কাংক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই স্থিতিশীলতার সময়কালে জাতি ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি অর্জন করে। জাতীয় উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অতীতের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বদলে মুক্ত অর্থনীতি জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে। অতীতের রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কোটি কোটি টাকার যে বোঝা রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপেছিল নতুন বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে তা কিছুটা লাঘব হয়। দারিদ্র নিয়ন্ত্রিত হয়। মাথাপিছু আয় বাড়ে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রতিটি সেক্টরে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়।

৮.খ. ৭৫ সালের ঘটনাবলী পৃথিবীর এই অঞ্চলে বলয়ের রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। ৭৫ এর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যে সব নেতা বা সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তারা বৃহৎ প্রতিবেশীকে তুষ্ট করার কৌশল করেন। কিন্তু 'দেবতা' তুষ্ট না হয়ে বরং রুষ্ট হন। তাই (ক) সীমান্তে সংহিসতা বৃদ্ধি পায়-এমনকি ঘোষিত রাজনৈতিক আশ্রয়ের আদলে সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়। (খ) ফারাক্কা ও ৫২টি অভিন্ন নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ ও বন্টনকে রাজনৈতিক দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় (গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা বৃহৎ প্রতিবেশীর অঘোষিত মদদ লাভ করে (ঘ) বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা তালপট্টিদ্বীপ বৃহৎ প্রতিবেশী জবর দখল করে নেয়। (৪) আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে অব্যাহত চাপের মোকাবেলা করতে হয়। জিয়াউর রহমান তাঁর স্বভাবসুলভ শান্ত, সতর্ক এবং সুদৃঢ় নীতিভঙ্গির কারণে প্রবল চাপ ও বাধাবিপত্তিকে মোকাবেলা করেন। ভারতের সাথে ফারাক্কা পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, বাণিজ্য স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং পার্বত্য সমস্যা সমাধানে ডিসটার্বড এরিয়া বিল পাশ করা হয়।

৮.গ. পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিবেশীর চাপকে অগ্রাহ্য করার জন্য জিয়াউর রহমান যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তা জাতিকে নতুন প্রত্যয় এবং গৌরব দান করে। সৌদিআরবসহ মুসলিম দেশগুলোর সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ধনী মুসলিম দেশগুলো ১৯৭৫-৮১ সময়কালে বাংলাদেশকে অকৃপণ সাহায্য সহযোগিতা দেয়। জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্বের সর্বত্র 'গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব' হয়ে ওঠেন। ইরান, ইরাক বিরোধ নিরসনে তাঁর মধ্যস্থতা প্রয়াস এবং আল কুদস্ শীর্ষ কমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তি দ্বারা এর প্রমাণ মেলে। পাশ্চাত্যের সাথে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ৭৫ এর পরবর্তীকালে দেয়া চীনের স্বীকৃতিকে মূলধন করে জিয়া জীবনের সাথে কার্যকর ও সমৃদ্ধ সম্পর্ক নির্মাণ করতে সক্ষম হন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এইসব নব বিন্যাস জাতির নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে সুসংহত করে। শীঘ্রই জাতি এর সুফল প্রত্যক্ষ করে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী পদে সম্মানজনক এবং দুর্লভ বিজয় অর্জন করে।

ঘরে বাইরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি জিয়া গোটা বিশ্বে ব্যাপক পরিণতি ও প্রশংসা অর্জন করে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' জিয়াকে "Hard working and apparently incorruptible in personal life." বলে অভিহিত করে। 'লন্ডন টাইমস' লিখে: "By and large president Ziaur Rahman fed the country away from false hopes and pointers guarrels."[14] ফিনান্সিয়াল টাইমস মন্তব্য করে: "General Zia's achivemenas since winnins power of a boody coup in 1975 have been counaiderable. He has not only brought relative stabiliti bet has lived by all his political promises. He has won international respect for himself and his country."[15] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশের খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল্লুর রহমান বলেন ঃ

'Ziaur Rahman provided Banglades' with a measwn of political crtacinty it had hot sun before it." মার্কাস ফ্রান্ডা মনে করেন: "Western world welcomed Zia" as the best thing that has happend to the country since it broke away from pakistan."

তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন জিয়া তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন ঃ শক্তিশালী সেনাবাহিনী, জনগণের সমর্থন এবং গণতন্ত্র। অবশ্য তিনটি জিনিসের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তালুকদার মনিরুজ্জামান মনে করেন একজন সামরিক শাসক যদি জনগণের দিকে ছুটে যান তিনি সামরিক বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে, সামরিক শাসকদের ভাল ধারণা নেই। এইসব সীমাবদ্ধতার মাঝেও জিয়া রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং সঠিক ধারণা পোষণের প্রয়াসী ছিলেন। তালুকদার মনিরুজ্জামানের ভাষায় ঃ

www.pathagar.com

"Zia was on the few rulers from the military profession who understood the need for politics and politicians. They tend to prescrbe sumple uniltary salutions complex political problems. Zia clearly understood the destinction in the functional roles of politics and arms. As he used to say Frequetly, politics should be met by politics fire-power by fire-power."[19]

রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাপনা

৯. জিয়া ঘরে বাইরে প্রত্যাশিত গণতন্ত্র সফল করতে গিয়ে দু'ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন।

১. বিরোধী দলীয় আন্দোলন

২. নিজ দলীয় অভ্যন্তরীণ সঙ্কট

১. ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ভাবালুতা ক্রমশ লোপ পায়। কর্নেল তাহেরের মর্মান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বরে জঙ্গীবামদের আন্দোলনের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য সময় এবং সুযোগ মতো তাঁরা সেনাবাহিনী এবং অন্যত্র তাঁদের 'বিপ্লবী' ভূমিকা অব্যাহত রাখে। ১৯৭৭ সালের ৩রা অক্টোবর একটি ব্যাপক প্রস্তুতিপূর্ণ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এতে তাহেরপন্থীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২০] ৭ নভেম্বর '৭৫ এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পরবর্তীকালে দ্বিধা এবং ত্রিধা বিভক্ত হলে জিয়াউর রহমান 'ডিভাইড এন্ড রুল' এর রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করেন।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ এর দ্বিধা বিভক্তি ঠেকাতে ভারত প্রবাসী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সংগঠন এবং আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বেই ১৯৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিরাজিত ভারত ও বাকশাল ভীতি এবং সামরিক শাসনের কচ্ছপনীতি শাসক জিয়াকে নিরাপদে রাখে। '৭৮ এবং '৭৯ এর জাতীয় নির্বাচনের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষকে ব্যস্ত রাখেন। ঘরোয়া রাজনীতি থেকে শুরু করে বহিরাঙ্গনের সম্প্রসারিত রাজনীতির মাধ্যমে জনগণ ও প্রতিপক্ষ পুঞ্জিভূত ব্যথা বেদনা ও ক্ষোভ ক্রোধ প্রশমনের সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য জিয়া 'কঠিন ও কোমল' (Stick and carrat) নীতি অবলম্বন করেন। নিজ দলকে সামনে রাখা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন। জিয়া আওয়ামী লীগ এবং জাসদকেই মূল প্রতিপক্ষ ভাবতেন। রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হলে দেখা যেত এই দু'দলের অনেক রাজনৈতিক কর্মী কারান্তরালে চলে গেছে। এক্ষেত্রে শীর্ষ নেতাদেরকে স্পর্শ না করে প্রকৃত কৃরিতকর্মাদের প্রতি জিয়ার চোখ ছিল বেশি। জিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও ম্যানেজ করতেন। অভিযোগ শোনা যায় 'দিনে পল্টন রাতে বঙ্গভবন' নীতির ক্ষেত্রে উগ্রবামপন্থীরাই অগ্রগামী ছিল। এ সময় মিজান চৌধুরী আওয়ামী লীগ এবং এম, এম আউয়াল এর নেতৃত্বে জাসদ দ্বিধা বিভক্ত হয়। জিয়া বিরোধীরা বলেন এই ভাঙনের পিছনে জিয়ার হাত ছিল। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, ঝড়ে বাদলে কাক মরে ফকিরে তাঁর কেরামতি ঝাড়ে। প্রেসিডেন্ট জিয়া এসব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা বরাবরই অস্বীকার করেছেন। অবশ্য তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষত সমাজে যারা প্রভাবশালী তাঁদেরকে তাঁর দলে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানাতেন অকপটে। এভাবে কোন রকম বড় ধরনের আন্দোলন ছাড়াই তিনি তাঁর শাসনকাল পরিচালনা করছিলেন। বিরোধীদলের চেয়ে বরং তাঁর নিজ দলের সঙ্কটই তাঁর জন্য বিপদের কারণ ছিল। চট্টগ্রামে এমনি একটি দলীয় অর্ন্তবিরোধ মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনি ঘাতকের বুলেটে প্রাণ হারান।

২. বিএনপি এর প্রতিষ্ঠাকালে নানা ধরনের নানা মতের এমনকি পরস্পর বিপরীত মতাদর্শের লোক বিএনপিতে যোগদান করে। আদর্শিক নৈকট্য, বিপরীত রাজনৈতিক শক্তির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত স্বার্থ এ সুবিধালাভ, সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন ইত্যাদি কারণে বি এন পিতে অসংখ্য লোকের সম্মিলন ঘটে। আদর্শিক চেতনা প্রবল না থাকায় ব্যক্তিগত উপ দলগত পেশাগত এবং আঞ্চলিক রেষারেষি তীব্রতর হয়। ফ্রন্ট থেকে যখন বিএনপি পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন ৭৬ জনের আহবায়ক কমিটি নিয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ১৯৭৯ সনের সংসদীয় নির্বাচনে এম.পি পদের নমিনেশন নিয়ে আর এক দফা অর্ন্তদ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। এছাড়া মন্ত্রীসভা গঠন নিয়েও তীব্র মত বিরোধ লক্ষ করা যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া সব বিতর্ক এবং দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করতেন। অবশেষে তাঁকে সবাই মেনে নিত। আগেই বলা হয়েছে কিছুটা ভীতি প্রদর্শন কিছুটা সুবিধা দান নীতি অনুসরণ করে তিনি

www.pathagar.com

ঘর সামলিয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। অনেক দুর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়। কিছুটা বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি আর বাড়াবাড়ি করেননি। অন্যান্য বিদ্রোহী অসন্তুষ্ট নেতা এবং এম. পিদের তুষ্ট করার জন্য 'দূতপুল' এবং জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী বা District Development Co-ordinator এর পদ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে প্রবীণ আমলা মোমেনখান, বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও শাহ আজিজের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হলে জিয়া অধিকাংশ এম. পি দের মতামতের ভিত্তিতে সম্ভবত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী করেন।

৩. বিএনপি এর ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল জিয়ার শাসনকালে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে কখনো কখনো প্রকাশ্য সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রদর্শন করে। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবার বন্দুক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বদনাম রটে যায় জিয়া সরকার ছাত্রদের অস্ত্র সরবরাহ করছে। জিয়া ব্যক্তিগতভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন: ছাত্রদলের অস্ত্রের উৎস অন্যান্য বিরোধী সংগঠনের মতো একই উৎস। তিনি অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন জিয়া বা সরকারের সংশ্লিষ্ট যখনই এসব অস্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছে দলমত নির্বিশেষে তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[২১] জিয়া রাজনীতিতে শক্তি প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন।

৪. নিজ সংগঠন ও ছাত্রদলের এসব অবস্থা দেখে জিয়াউর রহমান নিজ দলকে সুশৃঙ্খল ও জ্ঞানালোকে গড়ায় সচেষ্ট হন। রাজনীতিতে নীতি ও আদর্শবোধের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেন। নেতাকর্মীদের শিক্ষা এবং দীক্ষা দেয়ার জন্য তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দলের প্রতিটি কর্মী দলের আদর্শ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবে। মন্ত্রী, এম পি নেতা সবাইকে তিনি প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের চেষ্টা করেন। এসব প্রশিক্ষণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৯০০০ নেতাকর্মীকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে এই কেন্দ্রে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে। জিয়া নিজে এখানে বিভিন্ন আদর্শিক ও জাগতিক বিষয়ানুগ বক্তৃতা করেছেন। এসব নোট ও বক্তৃতাসমূহ এখনও ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান জনাব এ, কে, ফিরোজ নুনের নিকট

www.pathagar.com

সংরক্ষিত আছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বি এন, পি. এর 'আদর্শ ও দর্শন' সম্পর্কে মন্ত্রীদের একটি 'টেস্ট' নেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভি সি তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী এ ধরনের টেস্ট দিতে অস্বীকার করেন এবং পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন।[২২]

উপসংহার

১. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব এই জাতির ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ রাষ্ট্র তরণীকে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। ৭৫ পরবর্তী টালমাটাল দিনগুলোতে তাঁর মতো ধীশক্তি সম্পন্ন সাহসী এবং দূরদর্শি রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব না হলে এই জাতিকে আরও দুর্যোগ পোহাতে হতো। তিনি এই জনগোষ্ঠীকে কর্মউদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। তাদেরকে সততা, নিষ্ঠা দেশপ্রেম শিখিয়েছেন। কৃষি শিল্প এবং শিক্ষার মাধ্যমে একটি আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন।

২. তাঁর কর্মকৌশল ছিল-আপনি আচরি ধর্ম পরে শেখাও। তিনি কোদালকে কোদাল বলার সৎ সাহস রাখতেন। তিনি নিজে কোদাল ধরেছেন। মাটি কেটেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সন্দেহাতীত ভাবে সৎ, সহজ সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তড়িৎ, প্রত্যয়ী এবং প্রজ্ঞাবান দিলেন। তিনি এই দেশের 'রাজা' ছিলেন না। কর্মবীর ছিলেন।

৩. জাতীয় স্বার্থে তিনি আপোষ করেননি। প্রতিবেশী, পূর্ব অথবা পশ্চিম কোথাও তিনি মাথা নত করেননি। তাঁর ব্রত ছিল শির দেগা নাই দেগা আমাগা। 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ। জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।' জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

www.pathagar.com

Foot Notes :

1. S.P. Huntington, Palitical Order in changing societies (New Haven, Yole Univ. Press, 1988) PP, 252-55.
2. M. Q. Zaman, Ziaur Rahman: Leaderaship styles and Mobilijation policies," in Bangldesh: society palitics and Bureaucracy, Mohebbat Khan and P thoep (eds) Centre for administrative studies, Dhaka, 1984) P,101.
3. Weekly Bichitra, 5 January, 1977.
4. Marcus franda, Bangladesh The first Decade South Asian Publisher, New Delhi, 1982) P, 297.
5. Craig Baxter, Bangladesh A New Nation in an old setting (westviewpress, London,1984) P, 60.

   For the quotetion see,
6. Marcus Franda, Ibid P, 286,
7. Zillur Rahman Khan, Martial law to Martial law: Leadership Crisis in Bangladesh (UPL. Dhaka, 1984) P, 189.
8. For example such a copy is inclond at the end Marcus franda Ibid 263.
10. Talukder Manirujjaman, Civilianijation of Military Regimes (Monogroph) BIISS, Dhaka, 1981) P. 45.
11. Zillur Rahman khan, Ibid, P, 197.
12. A.Z.M. Enayetullah khan, "Blood sweet and tears" Far Eastern Economic Rcview 12, July, 1982.
13. For details with relevant statistical data please see syed serajal Islam, Bangladesh: state and Economic strategy (UPL, Dhaka, 1988) and Emajuddin Ahamed, "Development strategy in Bangladesh: probable Political Consequenns, Asian Survey November, 1978
14. Quated in Marcus Franda Ibid. P, 134.
15. Quated in syed serajul Islam, Ibid, P, 157.
16. Opcit.
17. Zillur Rahman Khan Ibid, P, 261.
18. Marcus Franda, opcit, P. 10.

www.pathagar.com

19. Talukder manirujjaman, Group interest and political changes: Studied Pakistan and Bangladesh (South Asian; New Delli, 1982. P. 264.

20. Abdul Latif masoom, Role of the Military in Bangladesh: A political study of Zia Rigimes (75-81).

Unpulished Ph. D dessertation, Jadavpur University, Calcuta 1990, PP, 178-195.

21. Personal interview with the them Foreigu minister late Col. Mostafizur Rahman at him Motizheel Commercial office on March, 1989.

22. Prof. Iqbal Mahmood, Conforined it in an Interview on 22 october 1997 in Dhaka.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

১. জিয়াউর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

(ক) নাম ঃ জিয়াউর রহমান, ডাকনাম ঃ কমল

(খ) বাবার নাম ঃ জনাব মনসুর রহমান

(গ) জন্ম তারিখ ঃ ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬

(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ বাগবাড়ি, বগুড়া।

(ঙ) প্রাথমিক পড়াশুনা ঃ হেয়ার স্কুল, কলকাতা

মাধ্যমিক ঃ তাইয়েব আলভী একাডেমী, করাচি

উচ্চ মাধ্যমিক ঃ ডি, জে, কলেজ, করাচি

(চ) সামরিক বাহিনীতে কমিশন লাভ ঃ ১৯৫৩

(ছ) উচ্চতর শিক্ষা ঃ পি এস, সি, কোয়েটা ষ্টাফ কলেজ

(জ) দায়িত্ব ঃ

১৯৬৫, কোম্পানী কমান্ডার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট খেমকারান সেক্টর।

ঃ ১৯৬৬ ইন্সট্রাক্টর, সামরিক একাডেমী, কোয়েটা

ঃ ১৯৬৯ অফিসার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, জয়দেবপুর, ঢাকা

ঃ ১৯৭০- ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

ঃ ১৯৭১ স্বাধীনতা ঘোষণা ও একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

ঃ ঃ ১৯৭২ স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বীর উত্তম' উপাধি লাভ।

ব্রিগেড কমান্ডার, কুমিল্লা - ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, সেনাবাহিনী

ঃ ১৯৭৫ সেনাবাহিনী প্রধান - উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

১৯৭৬ - প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

ঃ ১৯৭৮ - প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত, বিএনপি এর প্রতিষ্ঠা / চেয়ারম্যান মনোনীত

১৯৭৯ - সংসদ নির্বাচন/বিপুল বিজয় - সামরিক আইন প্রত্যাহার।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন/জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ও ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান।

১৯৮০-জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দান।

১৯৮১ - 'আল কুদস' কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ইরাক ইরান যুদ্ধাবসানে প্রচেষ্টা।

(ঝ) ব্যক্তিগত জীবন ঃ বিয়ে ঃ ১৯৬০

স্ত্রী ঃ খালেদা খানম (পুতুল)

সন্তান ঃ তারেক রহমান (পিনু) ও আরাফাত রহমান (কোকো)

(ঞ) মৃত্যু ঃ ৩০ মে, ১৯৮১ (সেনাবাহিনীর কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হাতে শাহাদাত বরণ)

www.pathagar.com

২. প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রথম ভাষণ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম,

প্রিয় দেশবাসী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সরকারের কর্মসূচি ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আমি আপনাদের নিকট বক্তব্য রেখেছি। আজ রাষ্ট্রপতি হিসেবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তার আগে আমার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এতদিন পর্যন্ত যে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন সেজন্য তাঁকে আমি আমার নিজের ও আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর অবসর জীবন সুখের ও শান্তির হোক- এই দোয়া করি।

গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান স্বপ্নকে অবিরাম কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পথে দেশ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আমার আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আমি ও আমার সরকার আপনাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাব-এ আমাদের অটুট সংকল্প।

দেশে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বি ডি আর, আনসার, মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশেষ করে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে এবং মারাত্মক চোরাচালান রোধ করতে বহুলাংশে সফল হয়েছে। শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গনে সাধারণভাবে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। এভাবে আমরা দুর্যোগের দিন কাটিয়ে সৃজনশীল ও গঠনমূলক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি।

আমি ও আমার সরকার পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং দেশে যথাসময়ে জনগণের নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সরকারের প্রতিটি কাজে ও নীতিতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সে উদ্দেশে সরকার কতিপয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে এবছরে অনুষ্ঠিতব্য

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয় একথা সবারই জানা আছে। কিন্তু নীতি হিসেবে আমরা মনে করি অন্যান্য নির্বাচনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সাধারণ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমি ঘোষণা করছি যে, এবছরের আগষ্ট মাসে পৌরসভাসমূহের এবং ডিসেম্বর মাসে জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আশা করব যে, সর্বস্তরের নির্বাচনে দেশপ্রেমিক জনদরদী ব্যক্তিরা দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ইতোমধ্যেই তাদের গঠনমুখী মনোভাব ও কর্মপন্থার পরিচয় দিয়েছেন। তা অব্যাহত থাক এই কামনা করি।

শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু মৌলিক আদর্শ ও বিধান সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের মানুষের মন ও মানসিকতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক সংশোধনী জারি করা হচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস এই ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ়তর করবে, এবং জাতি গঠনের কাজে সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৭৫ সালের মহান ৭ই নভেম্বর হতে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও জাতি আমার উপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আমি আমার সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছি এবং আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে আপনাদের আস্থা ও সমর্থনের উপরই নির্ভর করেছি। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ে ইতোমধ্যেই কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখন আমার উপর দেশের রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইনশা আল্লাহ এবারও আমি আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করব। এই প্রেক্ষিতে আপনাদের আস্থা যাচাই করার জন্য আগামী মাসের ৩০ তারিখে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী একটি গণভোট অর্থাৎ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি আপনারা আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সাহায্য করবেন।

গ্রাম বাংলাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষকে সম্মান করে, তাদের খেদমত করে, উন্নত হবে সারা দেশ। এই নব রূপায়ণের পথেই আমাদের যাত্রা। তাই ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর জাতির গভীর আস্থা ও ভরসা। স্থানীয় নেতৃত্ব থেকেই জন্ম নেবে জাতীয় নেতৃত্ব, যাতে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক কখনো শিথিল না হয়।

www.pathagar.com

জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজের দিকে যাওয়ার দায়িত্ব সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির। সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রেখে তারা জনগণের খেদমতে এগিয়ে আসবেন এই আমার বিশ্বাস।

জাতি আশা করছে রাজনীতিবিদরা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং জনসেবার ক্ষেত্রে এক গঠনমুখী আদর্শ স্থাপন করবেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সুশৃঙ্খল রাজনীতির পথ কখনো বিঘ্নিত হবে না এবং পর্যায়ক্রমে খোলা রাজনীতির পথ প্রশস্ত হবে।

ক্ষেতে খামারে, কলকারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হবে। লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছুতে হবে এবং তা ছাড়িয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষক ভাইদের দায়িত্ব অপরিসীম। নিজেদের অভাব মেটাতে হবে এবং দেশের দৈন্য ঘুচাতে হবে। দেশের খাতিরে প্রয়োজনবোধে সাময়িক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। দেশ সমৃদ্ধ হলে সবাই সুখী হবেন। অভাব থাকলে তা সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে। সরকার ও জনসাধারণকে কর্মের ও নীতির মাধ্যমে এই সত্যকে বাস্তব রূপ দিতে হবে।

দেশে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ মজুদ আছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। বহির্বাণিজ্য বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতির ও দাবিদাওয়ার যৌক্তিকতা বাস্তবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে সবাইকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। একাজে আল্লাহর উপর অবিচল ঈমানই আমাদের শক্তি ও সাহস জোগাবে।

সর্বতোভাবে দেশের শান্তি বজায় রাখতেই হবে। যদি এ শুভযাত্রায় কেউ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করে, তবে সরকার ও জনসাধারণ তা কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করবে না এবং তার মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে।

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ও প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে অনেক মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি জাতিকে মর্মাহত করেছে। আবার সাথে সাথে সমবেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে সারা জাতি সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনর্বাসনের কাজে হাত দিয়েছে। এ অত্যন্ত গৌরবময় পথ নির্দেশক দৃষ্টান্ত।

ধর্ম, গোত্র ও শ্রেণীগত বিভেদ ভুলে গিয়ে জাতি হিসেবে প্রত্যেকটি বাংলাদেশী একাত্মতা ঘোষণা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সূত্র ঃ বিচিত্রা, ৫বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২৯ শে এপ্রিল ৭৭, ১৬ ই বৈশাখ ৮৪।

www.pathagar.com

সিপাহী বিপ্লবের ১২ দফা দাবি (সংক্ষিপ্তসার)

১. সামরিক বাহিনীর ঔপনিবেশিক অবকাঠামোর পরিবর্তন।

২. সকল রাজবন্দীদের আশু মুক্তি।

৩. দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪. সামরিক বাহিনীতে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে বিরাজিত সকল বৈষম্যের অবসান। কাজ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ।

৫. সুবিধাবাদী শ্রেণী থেকে অফিসার নিয়োগ বন্ধকরণ।

৬. সেনানিবাসসহ সর্বত্র ঔপনিবেশিক রাজনীতির অবসান।

৭. সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি।

৮. ব্যাটম্যান প্রথার বিলোপ।

৯. 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' গঠন এবং সেনানিবাসের কর্তৃত্ব তাদের হাতে হস্তান্তর।

১০. গোটা সামরিক বাহিনীর 'পার্লামেন্ট' হিসাবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার স্বীকৃতি। 'বি. স. স' এর সাথে পরামর্শক্রমে সামরিক বাহিনী পরিচালনা।

১১. 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'কে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান। এই কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন নিশ্চিত করবে।

১২. প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী ছাত্র, কৃষক এবং শ্রমজীবি মানুষের সহায়তায় ভবিষ্যত সমাজবিপ্লব সম্পাদনের পক্ষে সামরিক বাহিনীকে পরিচালনা।

www.pathagar.com

১৯ দফা কর্মসূচি

দেশের আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিম্নলিখিত ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন ঃ

১। সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা।

৩। সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। প্রশাসনের সর্বস্তরে, উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮। কোনো নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১০। সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১। সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ-শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪। সরকারি চাকরিজীবিদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬। সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

www.pathagar.com

১৭। প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮। দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

www.pathagar.com